স্মৃতি

শ্রীউমাপদ খাঁ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একটি ছোট খাম, তাকে কেন্দ্র করে যে এত কাণ্ড ঘটতে পারে বীরেনের সে ধারণা ছিল না। একটা পরিচিত হাতের বাঁকা অক্ষরে লেখা রঙিন কাগজ-বাহী খামখানা যে এমন পূজার দিনে এই রকমের অপ্রিয় অবস্থার সৃষ্টি করবে—বীরেন কল্পনায় তা ভাবে নি। বাড়ুয্যেবাড়ীর কাঁসর-ঘন্টা-ধ্বনিতে মুখরিত পূজামণ্ডপের প্রান্তে যখন সে এসে হাজির হোলো তখন তার মন উচ্ছ্বাসে ভরপুর, হাল্কা হাওয়ায় উড়ে বেড়ান প্রজাপতির মত তার মনের অবস্থা। গ্রামের ছেলে বীরেন, সকলেরই পরিচিত। না হয় আজ সে ডাক্তারী পড়ে, কিন্তু সেদিনের দৌড়ে-বেড়ান ছোট বীরেনের মূর্ত্তিখানি তো আজও গ্রামের বহু দাদা-কাকাদের মনের মুকুরে ধরা পড়ে আছে। বীরেন সবচেয়ে ছাপ ফেলেছে সবার মনে এই সেদিন, কলেরা আর বসন্তে যখন গ্রামখানা একেবারে উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। মানুষের মুখে চোখে ভয়ের ছায়া, এপাড়ায় ওপাড়ায় ভেসে উঠা কান্নার রোল! পল্লী-প্রধানগণ সংস্কারবশে সংক্রমণ প্রতিরোধের বিধানসম্মত ব্যবস্থার দিকে না তাকিয়ে পুরাদমে শীতলা পূজা আর হরিনামসংকীর্ত্তনের আয়োজনে মত্ত। কেউ কারও বাড়ীর রোগীটির খোঁজ নেয় না, কান্নার সুর শুনে ধরে নেয় ওপাড়ার ননেবালাটা বোধ হয় মরেছে। কালো, কদিন থেকে তারই

অবস্থা তো খারাপ ছিল। কিন্তু আসলে তখন মারা যায় গ্রামের—বাপ্‌বেটার দুজনেরই চক্রবর্ত্তী খুড়ো—মধু চক্রবর্ত্তীর বুড়ো বয়সে পাওয়া সেই ছেলেটি—নাম তার আশাকুমার। গ্রামের যখন এমন অবস্থা তখন বীরেনের বড়দা গজেনবাবু কলেজের ছাত্র বীরেনকে চিঠি লিখে এই কথা জানাল। তরুণ বীরেন চিঠি পেয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে: খালের পারের তার ছোট গ্রামের মানুষগুলো এমনি ভাবে মারা যাচ্ছে ভেবে সে বিচলিত হয়ে দেরী না করে বন্ধুদের কাছে সহপাঠীদের কাছে আবেদন জানায়, সেই দুর্দ্দিনে সেবা দিয়ে তার গ্রামকে বাঁচানোর জন্যে। তার কয়েকজন ডাক্তারী পড়া বন্ধু সাগ্রহে সম্মতি জানাল বীরেনের সঙ্গে মহামারীতে আক্রান্ত তার গ্রামে যাওয়ার জন্যে। বীরেন বেড়িয়ে পড়ে স্বেচ্ছাসেবকের দল নিয়ে। গ্রামে এসে অক্লান্ত পরিশ্রমে চিকিৎসা ও সেবায় তিন দিনে গ্রামে কলেরা ও বসন্তের প্রকোপকে বন্ধ ক'রতে সমর্থ হয়। গ্রামের বৃদ্ধেরা বললেঃ তাঁদের পূজার ও নিষ্ঠার জোরে সেটা সম্ভব হয়েছিল—বামুন পাড়ার গিন্নিবান্নিরা বল্‌লেনঃ এটা নাকি তাঁদের গত কয়েক দিনের উপবাস করে ঠাকুরকে ডাকার প্রত্যক্ষ ফল। প্রকাশ্যে যে যাই বলুক না কেন সবাই মনে মনে স্বীকার করলে—বীরেন অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রামের চতুর্দ্দিকে নানা ধরনের ওষুধ ছড়ানোয়, স্বেচ্ছাবেক দল নিয়ে নির্ভয়ে রোগীর সেবা করায় গ্রামে ব্যাধির প্রকোপ কমে এসেছিল। সেই সময় থেকে বীরেন নিজের এবং আরও বহুর

অজ্ঞাতসারে গ্রামবাসীর স্নেহের পাত্র হয়ে উঠ্‌লো। বীরেনের জনপ্রিয়তা কেবল বাড়ুয্যেবাড়ীর ঠিক সহ্য হোতো না। বৃদ্ধ রামতনু বাড়ুয্যে বল্‌তেন "যুবক বয়সে ওরকম সেবাটেবার ইচ্ছা একটা জাগে, আমরাও তখন কত কি করেছি। কিন্তু বীরেনটিকে একেবারে দেবতার পর্য্যায়ে এনে খাতির করার যে কি ঘটেছে তা বুঝি না, যত সব!"

যে যাই বলুক না কেন বীরেনের জনপ্রিয়তা—বিশেষ করে গ্রামের তরুণ যুবক আর শিশু ও নারী মহলে—দিনের পর দিন বেড়ে গেল। ছুটীতে বীরেন বাড়ী এলে গ্রামে প্রাণের চাঞ্চল্য জেগে ওঠে, যুবমনে যেন কিসের সাড়া পড়ে যায়। ছেলেবেলায় ছোট্ট আলাপটা সময় ও সুযোগের অভাবে ঘনিষ্ঠতা লাভ না করলেও বাড়ুয্যেবাড়ীর ষোড়শী কন্যা শান্তিলতা বীরেনের জনপ্রিয়তায় খুসী হয়েছিল. অজ্ঞাতে তার মনের কোণে যেন এই অক্লান্ত কর্ম্মীর জন্যে ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

তারপর কয়েকটা বছর কেটে গেছে ; বীরেন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়ে ; মাঝে মাঝে ছুটীতে বাড়ী আসে, এবারেও সে এসেছিল ছুটীতে। একটা চিঠি ছিল বাড়ুয্যেগিন্নি অচলা দেবীর অর্থ্যাৎ শান্তিলতার মার, গ্রাম সুবাদে বীরেনের মাসীমার। সেই চিঠি সে দিতে এসেছিল। পূজামণ্ডপে পা দিতে না দিতেই ভীড় করে ছেলের দল এক সঙ্গে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে—"এসেছে—এসেছে!" সবাই যেন বীরেনের

জন্যেই অপেক্ষা করছিল। দৌড়ে আসে তরুণের দল বীরেনের কাছে—ছেলের দল এসে ভীড় করে দাঁড়ায় বীরেনের চারিদিকে—প্রশ্ন করে তাকে—"বীরেনদা কবে এলেন? থাক্‌বেন তো এখন কয়েক দিন?" ইত্যাদি। ঠাকুরের পূজা দেখা ছেড়ে অধিকাংশ ছেলে ছুটে আসে বীরেনের কাছে। বীরেন কত মজার মজার গল্প তাদের শুনিয়েছে এর আগে। বীরেন কথা বলতে পারে সুন্দর করে—বলার ভংগীটি চমৎকার,—সদা হাসিমাখা মুখখানি যেন কথার ঝরণা। এর আগে কতদিন বীরেন খালের ধারে বসে—বই-এ পড়া বা বানিয়ে বলা গল্প নয়—হাসপাতালে সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনায় সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে। কিছুদিন আগে যখন সে বলেছিল কি ভাবে একটা মেনিনজাইটিস্ রোগী নার্স আর ডাক্তারদের চোখ এড়িয়ে তার বিছানা ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে হাসপাতালের পিছন দিকে সেই বুড়ো আমগাছটাতে উঠে বসেছিল। ওঃ সে কি বিপদ' চতুর্দ্দিকে খোঁজাখুঁজি—পুলিশে খবর দেওয়া, নার্স আর ডাক্তারের চাকুরী যায় আর কি! রোগীর বাড়ীর লোক ধমকায়—কেস্ করবে। জ্যান্ত মানুষ ভূত হয়ে যেন গাছে উঠে গেছে! কথাটা শুনেই তো ক্লাস ফোরে পড়া হারুর চক্ষু স্থির—বীরেনকে জড়িয়ে ধরে আঁৎকে ওঠে। এমন কত গল্প গুজবে বীরেন তার জনপ্রিয়তাকে ধীরে ধীরে বাড়িয়েছে।

পুরোহিত অন্যমনস্ক হতে পারে এই আশঙ্কায় বীরেন তার পাশে ভীড়করা ছেলের দলকে নিয়ে মণ্ডপের এক প্রান্তে সরে

যায়। পুরুতঠাকুর আড়চোখে তাকাল। বীরেন দেবীমূর্ত্তিকে আর একবার ভাল করে দেখে নেয়। মন্দির দ্বারে পট্টবস্ত্রপরিহিতা দুইজন মহিলা দণ্ডায়মানা, বীরেন মন্দিরের দিকে লক্ষ্য করতেই তাঁদের সঙ্গে চোখাচুখি হয়: তাঁরা বীরেনের দিক থেকে সলাজে চোখ ফিরিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল—তাঁদের চোখের কোণে চাপা হাসি। এতক্ষণে বীরেন তার ঘিরে থাকা ছেলেদের নিয়ে মণ্ডপের প্রান্তে পেঁৗছে গেছে। অনাদি অর্থ্যাৎ অনাদি সরকার জিজ্ঞাসা করে—"বীরেনদা, এবারে কলকাতার পূজার বাজার কেমন?" "ভাই, কলকাতার বাজার চিরদিনই এক রকম: অন্যের সম্পদ লুটে যারা বড় হয় তাদের অবস্থা চিরদিনই ভাল।" বীরেনের উত্তর অনাদি যেন বুঝতে পারলো না, বীরেন অনুমান করে আবার বল্‌লো—"ভাই, গ্রামের অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে। কিন্তু কলকাতা ব্যবসার কেন্দ্র হওয়ায় -সেখানের অবস্থা খারাপ হ'লেও বোঝা যায় না। অলিতে গলিতে সার্ব্বজনীন পূজার হিড়িক দেখে মনেই হয় না যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন বিপর্য্যয় ঘটেছে: আর মধ্যবিত্তের ভীড় কিছুতেই বুঝতে দেয় না যে মানুষের অবস্থা এতটুকু খারাপ হয়েছে।"

বীরেন মণ্ডপের দূরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বলছিল, কিন্তু তার দৃষ্টি ছিল বাড়ুয্যেবাড়ীর ভিতর দরজার দিকে। তখনও অচলা দেবীর চিঠিখানা তার বুক পকেটেই বিশ্রাম করছিল,—তাকে যথাস্থানে পেঁৗছে দিতে পারলেই যেন সে

আশ্বস্ত হতে পারে। এই চিঠি সাধারণ কারও হ'লে হয়ত তার এ ব্যস্ততা থাকতো না, কিন্তু স্বয়ং শান্তিলতার চিঠি যে। বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে প্রায় একঘন্টা কেটে গেছে, এমন সময়ে দেখা গেল বাড়ুয্যেবাড়ীর বড়গিন্নি অচলা দেবী চওড়া ঘন লালপাড় সিল্কের শাড়ী পরে দেবীর মন্দিরের দিকে আসছেন। তিনি এসেই দেখে বিস্মিত হলেন যে ছেলে-ছোকরার দল পুজার স্থান ছেড়ে প্যাণ্ডেলের একদিকে জটোলা করছে। সামনে পাওয়া সে পাড়ার দুলে বউকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় সে বললো—ঐ মণ্ডলবাড়ীর বীরেনবাবু এসেছে কি না! তার বক্তব্যের মধ্যে যেন শ্রদ্ধা প্লাবিত হয়ে উঠলো। গিন্নি মুখ বেঁকিয়ে বিকৃত সুরে বললেন—"তাতে হয়েছে কি, এই গাঁয়েরই ছেলে তো! তাকে নিয়ে এমন গোলপাকানোর কি আছে, ঠাকুরের চেয়ে বীরেন বড় হোলো, ছোঁড়ারা পুজো দেখা ছেড়ে তাকে নিয়ে ছুটলো। দিনে দিনে কি হোলো!" ঠাকুরের দিকে ফিরে তিনি যুগল হাত মাথায় ঠেকালেন। ভাবটা এই—অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেদের বেয়াদপিতে মা দুর্গা যেন কিছু মনে না করেন।

বীরেন অচলা দেবীকে লক্ষ্য করেছিল, তাই কথাবার্ত্তার উপসংহার তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে অচলা দেবীর দিকে এগিয়ে এল। তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের এক দল তার পিছনে এল, আর বাকী সব এদিকে ওদিকে চলে গেল।

বীরেন সোজা এসে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে অচলাময়ীকে প্রণাম করলো,

এবং বাধা দেওয়ার আগে ভক্তিভরে দু'পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালো। বিরক্তি ও বিস্ময়ে অচলাদেবী বললেন—"এঃ ছুঁয়ে দিলি?"

ততোধিক বিস্মিত হ'য়ে বীরেন জিজ্ঞাসা করলো—"কেন কি হ'য়েছে মাসীমা?"

"কি হয়েছে কি? সবেমাত্র চান করে শুদ্ধ হয়ে মন্দিরে যাব বলে এসেছি, তা তুই ছুঁয়ে দিলি। পা ছুঁয়ে প্রণাম না করলেই কি চল্‌তো না? মনে মনে ভক্তি করলেই ঢের হয়।" বীরেন তর্ক করতে খুব পটু এবং ভালও বাসে, চট্‌ করে বলে ফেললো—"মাসীমা আপনারও যদি মনে ভক্তি থাকে তা হলে আমার ছোঁয়া অবস্থায় ঠাকুর-মন্দিরে ঢুকলেও দেবতা কিছু মনে করবেন না।" জমিদার-গৃহিনী সহজেই বুঝলেন বীরেনের সঙ্গে অধিক তর্কে প্রবৃত্ত হ'লে অবস্থা আরও খারাপ হবে, তাই তিনি একেবারে কথার মোড় ঘুরিয়ে নরম সুরে বললেন—"তা সত্যি, কিন্তু ডাক্তারী পড়িস্‌, কত মড়া ঘাটিস, ব্যাঙ প্রভৃতি কত নোংরা জিনিষ কাটিস্‌ কি না।" বীরেন ছাড়বার পাত্র নয়, গম্ভীর ভাবে বললে "হ্যাঁ মাসীমা, মড়া আমরা ছুঁই মানুষকে সহজে মড়া না হতে দেওয়ার সাধনায়।" অচলা দেবী কথাটা ঠিক বুঝলেন না—বললেন "সে তো ঠিক, তা কি খবর বল দেখি?" বীরেন বুক পকেটে হাত দিয়ে শান্তিলতার প্রেরিত চিঠিখানা বার করতে করতে বললো—"আপনার একখানা চিঠি আছে।"

পাছে বীরেন আবার ছুঁয়ে ফেলে সেই সম্ভাবনায় অচলাময়ী তাড়াতাড়ি বললেন—"তা চিঠিখানা নায়েবমশায়ের হাতে দাও।"

এদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে নায়েবমশায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, চোখের সুতো বাঁধা চশমাটাকে নাকের ডগায় ঠেলে দিয়ে তার ওপরের ফাঁক দিয়ে এতক্ষণ বীরেনকে নিরীক্ষণ করছিলেন, ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়িয়ে খামখানা নিয়ে ওপরের ঠিকানাটায় চোখ বুলিয়ে নিলেন, এবং একটু হেসে বললেন—"এ আমাদের শান্তিমায়ের চিঠি।" বীরেন একটি ছোট্ট হুঁ বলে নায়েবমশায়ের বক্তব্যের সত্যতাকে স্বীকৃতি জানালো। আর কোন কথাবার্ত্তা না থাকায় বীরেন প্রস্থানোদ্যোগ করলে অচলা দেবী বলে উঠলেন—"আচ্ছা বীরেন, এই নিয়ে দু'বার শান্তি তোমাকে দিয়ে চিঠি পাঠালো। কেন, পিয়নকে দিয়েও তো এ চিঠি পাঠাতে পারতো?"

"তা পারে, কিন্তু কি জানেন মাসীমা আমি গ্রামেরই ছেলে—আপনাদের সবার পরিচিত, তাই আসার সময় শান্তি দেবীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি এটা আমার হাতে পাঠিয়েছেন।" বক্তব্যে মাসীমা খুসী হলেন না। কিন্তু বীরেন সে দিক দিয়েও গেল না, নিজের অজ্ঞাতসারে অসাবধান অবস্থায় প্রাণের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে ফেললো,—বললো—"জানেন কি মাসীমা, গ্রাম ছেড়ে সহরে অপরিচিত জনতার মধ্যে সত্যি খুব খারাপ লাগে, তাই শান্তি দেবী আর আমি পরস্পরের মধ্যে গ্রাম্যজীবনের পুরাতন পরিচয়টাকে খুঁজে ফিরে আনন্দ পাই। সুতরাং

শান্তি দেবীর সামান্য চিঠি বয়ে নিয়ে আস্‌বো এতে আর কি হয়েছে?"

অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে কথাগুলি বলে ফেলে বীরেন সত্যই লজ্জিত হোলো এবং মনে মনে অনুভব করলো সে ঠিক করে নি। এই সামান্য পরিচয়কে কেন্দ্র করে অচলা দেবী হয়ত নানা অহেতুক কল্পনার জাল বুনে চল্‌বেন। নিজে দুঃখ পাবেন, হয়ত তার আঘাত শান্তিলতার গায়ে গিয়েও লাগবে। ভেবে এসেছিল একমাত্র কন্যা শান্তিলতার চিঠি পেয়ে অচলাময়ী খুসী হবেন এবং পত্রবাহক বীরেনকে ধন্যবাদ না জানালেও আঘাত দেবেন না, কিন্তু সে ভাবনা মিথ্যা হোলো। অচলা দেবী বললেন—"দেখ বীরেন, তুমি আর আমার মেয়ে একই গ্রামের ছেলে মেয়ে হতে পার, গ্রাম সংবাদে একটা পরিচয়ও থাকতে পারে, তোমরা দুজনে কলেজে পড়তে কলকাতায় গেছ এবং আছ সবি সত্যি; কিন্তু দু'জনের এই যে মেলামেশার কথা বললে এটা অত্যন্ত অশোভন! আমার মেয়ে—জমিদারবাড়ীর মেয়ে—শান্তি তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে একথা তুমি দ্বিতীয় দিন উচ্চারণ কোরো না, আর ভবিষ্যতে তুমি তার কোনো চিঠিপত্র আনবে না।"

কি থেকে কি হোলো—বিস্মিত বীরেন ঘাড় নেড়ে সেখান থেকে চলে গেল। বাড়ুয্যেগিন্নির কথা শুনে ইতিমধ্যে আসে-পাশের দু'চারজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ চোখ তুলে অচলা দেবী বুঝলেন এমন প্রকাশ্য স্থানে নিজের কন্যার

সম্পর্কে আলোচনা সত্যই খারাপ হয়েছে।

অন্যের ব্যাপার নিয়ে বিরূপ আলোচনায় মানুষের মন স্বভাবতই খুসী হয়। শান্তি কলেজে পড়ে এইটাই গ্রামের বহু লোকের চক্ষুশূল। কিন্তু নেহাৎ জমিদারবাড়ীর মেয়ে বলে কেউ প্রকাশ্যে কোনো কথা বলতে সাহস করে না। আজ যখন তারই মায়ের মুখ থেকে তার সঙ্গে বীরেনের অবাধ মেলামেশার সামান্য ইঙ্গিত মিললো তখন এমন মজার খবরটা মজাদার খবর রূপে পূজা-দেখতে-আসা মেয়ে মহলে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো। সকলে সকলকে খবরটা বিস্তৃত করে বললো এবং অন্যকে না বলার প্রতিশ্রুতি আদায় করলো; কিন্তু বীরেনের প্রতি সকলেরই একটা স্নেহ ও শ্রদ্ধার ভাব থাকায় ব্যাপারটি যে অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় যায় নি তা সকলেই ধরে নিল; কিন্তু কাণ্ড যাই হোক না কেন এর জন্যে যে শান্তিই দায়ী এটা যেন শতকরা নব্বুই জনের ধারণা হোলো।

বীরেন অচলাময়ীর সঙ্গে প্রাণ খুলে একটু গল্প করবে এই আশা নিয়েই গিয়েছিল; কিন্তু প্রণাম করা এবং চিঠি দেওয়া ব্যাপারে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হোলো তাতে করে আর অন্য আলোচনার অবকাশ ত ছিলই না—মনের প্রবৃত্তিও ছিল না।

কি যে ঘটে গেল বীরেন কিছুই সঠিক অনুমান করতে পারলে না। তবে এই ধারণা হোলো যে শান্তির সঙ্গে তার কলকাতার মেলামেশার সংবাদটা তার মাকে না জানানোই উচিত

ছিল। অজানা অশান্তিতে তার মন ভরে গেল। পথঘাট পরিচিত—গ্রামের মেঠো পথে তাই তার পা দুটো তাকে টেনে নিয়ে চলতে লাগলো। কিন্তু এই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম সে তার জীবনে এক নারীর কাছ থেকে আঘাত পেল। বীরেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, ভাল ছেলে, সেইজন্যে এই তুচ্ছ ব্যাপারটিকে সে উড়িয়ে দিতে পারলো না, তার মুখে চোখে চিন্তার ঘন ছায়া পড়লো। এই মুহূর্ত্তে বীরেনকে দেখে মনে হয় না যে এ সেই বীরেন যে নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে দিনরাত জেগে স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে এই কয়েক বছর আগে গ্রামকে মহামারী রাক্ষুসীর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বিশ্বাস হয় না—এই সেই বীরেন যে তার কোঁকড়া চুল দুলিয়ে লাইব্রেরীর বারন্দায় দাঁড়িয়ে উদাত্ত ভাষায় জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিরাট জনতার কাছে বক্তৃতা দিয়েছে।

বীরেন হাটতে হাটতে চিন্তা করছিল—বাড়ুয্যেবাড়ীর সঙ্গে তাদের যে চিরন্তন বিবাদ সেটা কি শেষ হ'বে না? গ্রামের মহামারীর সময় বীরেন যে সেবা করেছে তার সমালোচনা একমাত্র—বাড়ুয্যেবাড়ী আর তাদের অন্ধ অনুচরদের কাছ থেকে ছাড়া আর কোথাও ত কারো মুখে শোনা যায় নি। অচলা দেবী যেন অপেক্ষা করছিলেন—আঘাত দিয়ে তাঁর আভিজাত্য সম্পর্কে বীরেনকে সচেতন করে দেবেন। বহু এলোমেলো চিন্তা এসে বীরেনের মনে ভীড় করে।

জেলেপাড়ার সেই মোড়টা ঘুরতেই হঠাৎ বংশীর সঙ্গে দেখা। বংশী অচলা দেবীর একমাত্র ম্যাট্রিক ফেল-করা ছেলে

অর্থাৎ জমিদার বাড়ুয্যেবাড়ীর বিরাট সম্পত্তির একাই উত্তরাধিকারী এবং তারই প্রতিষ্ঠিত যাত্রাদলের ম্যানেজার ও স্বত্বাধিকারী। বীরেনকে দেখে বংশীই উৎসাহ সহকারে বলে উঠ্‌লো—"আরে বীরেন যে! খবর কি?"

"খবর?—হ্যাঁ, খবর ভাল!" উচ্ছ্বাসহীন ভাবে বীরেন উত্তর দেয়। বংশী অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলে "হ্যাঁ হে শুনলুম নাকি অনেকবার ডাক্তারী পরীক্ষায় ফেল করেছ?"

"ফেল?" বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ওঠে বীরেন। বংশী আবার সুরু করে—"আমি কি আর জানতে পারতুম, ঐ হরীশ-কাকা তো সেদিন বলছিল। হরীশকাকা সত্যি ভাই বড় মাইডিয়ার লোক। এই দেখ না যাত্রার দলে ওর মত দুটি উৎসাহী কর্ম্মী নাই। লোকটা স্পষ্টবাদী আর শ্রদ্ধা ভক্তি ওর খুবই বেশী। বাবাকে তো ভক্তি করেই, আমাকেও। কোন সংকোচ সরমের বালাই নেই, বয়স হ'লে কি হয়—নিজেই পকেট থেকে সিগারেট বার করে offer করে। কেউ নিতে ইতস্ততঃ করলে বলে—সখের সময় অত সরম কেন? যাক্ শোন। হরীশ-কাকা আরও একটা সংবাদ দিয়েছে, তুমি নাকি আজকাল একটু একটু মদটদ্ খেতে—এই মানে Drink করতে—শিখেছ? তা বেশ ক'রেছ—এ না হ'লে জীবন! তা ছাড়া ওসব না খেলে নাকি তোমাদের ডাক্তারী বিদ্যেয় মাথা খোলে না। তোমার মত যদি আমাকেও ছাত্রজীবনে মদ খাওয়ার সুযোগ দেওয়া হোতো আমি হলপ্ করে বলতে পারি বীরেন, আমি এক সঙ্গে দুটো

ম্যাট্রিক পাশ করতে পারতুম! তা বেশ করেছ, তুমি মদ ধরেছ! একদিন বিলাতী বোতলটা আনবে না হে? কি, আন্‌বে তো?"

এমনিতেই বীরেনের মন ঠিক ছিল না, তার ওপর এই জঘন্য মিথ্যার কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটি অভিজাত বংশের একমাত্র সন্তানের এই অধঃপতন লক্ষ্য করে দুঃখিত ও ব্যথিত হোলো। কারণ বীরেনের বরাবরেরই ধারণা—গ্রামের একটা ছেলে খারাপ হওয়ার অর্থই হোলো গ্রামের অকল্যাণ। কেবল বাড়ুয্যেবাড়ীর কথা চিন্তা করে নয়—সমগ্র গ্রামের অমঙ্গলের কথা কল্পনা করে বীরেনের নিরহঙ্কার কর্ম্মী মন ব্যথিত হয়ে উঠ্‌লো। বংশী আবার সুরু করলো—"আচ্ছা বীরেন, আর পয়সার শ্রাদ্ধ না করে যা শিখেছ সেই বিদ্যে নিয়ে গ্রামে চেয়ার বেঞ্চি নিয়ে একটা ডিস্‌পেন্সারী খুলে বোসো না কেন? যা হয় পেটের ভাতটা জুটে যাবে; আমরা তো আছিই, তোমাকে সাহায্য করবো।" পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করে দেশলাই এর ওপর কায়দা করে ঠুকে নিয়ে আরও কায়দা করে বেঁকিয়ে দুটি ঠোঁটের মাঝখানে চেপে হাতের ফাঁক দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে টান মারে। প্যাকেটটা বীরেনের দিকে এগিয়ে ধরে। বীরেন ফিরিয়ে দিয়ে বলে—"আমি তো সিগারেট খাই না ভাই!" "ওঃ আজকাল বুঝি পয়সার টান পড়েছে, তা বেশ করেছ। এ একটা বাজে নেশা। হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম—তোমাদের অবস্থাও তো আজকাল আর তেমন নাই, সুতরাং আর পয়সা খরচা করে বাড়ীর অসুবিধা করা কেন?

তা ছাড়া আইবুড়ো বোন যার বাড়ীতে--" বীরেন এতক্ষণ ধৈর্য্য হারায় নাই, কিন্তু বিরাজের কথা ওঠায় সে এই বেয়াদপ ছোকরার কাছ থেকে আরও অভদ্র মিথ্যা উক্তি শোনার আশা না করে বল্‌লো—"যাক্‌ ওসব কথা। আমার কাজ আছে ভাই. যাচ্ছি।" বলে বংশীকে এড়িয়ে বাড়ীর পথে দ্রুত পা চালিয়ে দিল। বংশী তার দিকে তাকিয়ে আবার বললো—"তোমার ভালোর জন্যেই বলছিলাম।" বীরেন কোন প্রত্যুত্তর দিল না। বংশী আপনমনে যাত্রার দলের একটি গানের কলি—"বঁধুয়া তুমি এলে না, বৃথা গেল মোর মধু রাত" ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাপাসুরে গাইতে গাইতে চলে গেল।

মণ্ডলদের সংগে বাড়ুয্যেদের রেষারেষি আজকের ব্যাপার নয়। ক'পুরুষ আগে যে এর আরম্ভ হয়েছিল তার হিসাব মহাকাল রেখেছে কি না জানি না, তবে আজকের মানুষের কাছে সেটা নিছক অনুমানের বস্তু হ'য়ে উঠেছে। দুটি পরিবারের মধ্যে বিরোধের এবং অপপ্রচারের একটি পার্থক্য আছে। বাড়ুয্যেরা অকারণে কেবল সময় অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে এবং জোর করে আভিজাত্যকে প্রকাশ ও প্রচারের অশোভন অভিপ্রায় নিয়ে প্রায়ই মন্ডল বাড়ীর বিরুদ্ধে বলে বেড়াতো। মণ্ডলরা ঠিক ততখানি হীন ছিল না। তারা অকারণে আঘাত দিত না, অন্যের দেওয়া আঘাতকে যখন ফিরিয়ে দিত তা হোতো অত্যন্ত মারাত্মক। বাড়ুয্যেরা অর্থের লোভ দেখিয়ে কিছু খোসামুদেকে হাতে রেখেছিল আর মণ্ডলবাড়ীর সমর্থক ছিল

গ্রামের যত দরিদ্র জনসাধারণ। তার কারণ, মন্ডলবাড়ী ডাক্তারের বাড়ী বলে খ্যাতি ছিল। বহু পূর্ব্বে এই বংশে কেউ ডাক্তার ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু এই সেদিন পর্য্যন্ত বীরেনের এক কাকাবাবু যে প্রতিপত্তি ও সুনামের সংগে চিকিৎসা করে গেছেন তা অনেক পাশ করা ডাক্তারের বরাতেও সম্ভব নয়। এই ছোট গ্রাম হরীশপুরের কেদার ডাক্তারের নাম আজও বৃদ্ধদের মুখে মুখে। কেদার মণ্ডল মহাশয়ের বাবা বুড়ো শিবুবাবু নাকি কোথায় বন্যার জলে ভেসে আসা কতগুলি কবিরাজী বই কুড়িয়ে এনে চিকিৎসা করতে সুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে কবিরাজ হিসাবে নাম করেন। মণ্ডলবাড়ী যখন শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছিল—বাড়ুয্যেবাড়ী তখন অতীতের আভিজাত্য আর প্রতিপত্তির নজীর তুলে আসর জমানোর চেষ্টা করছিল।

হরীশপুর গ্রাম ছোট হলেও নানা কারণে এর নাম বহু-বিশ্রুত। এককালে এ গ্রাম যে এই অঞ্চলের মধ্যে খুব সমৃদ্ধ ছিল তার জীর্ণ ইমারত দেখে অনুমান করা শক্ত নয়। গ্রামের অতীত ঐতিহ্য পুরোপুরি না থাক্‌লেও আজও হরীশপুর অন্য দশখানা গ্রামের আসরে একটি বিশেষ আসন পাওয়ার দাবী রাখে। গ্রামের পূব দিকে মজে যাওয়া যে খালে অঘ্রাণ পৌষ থেকেই জল শুকিয়ে যায় সে খালে এককালে কত বড় বড় নৌকা যাতায়াত করতো। ভরা বর্ষায় আজও যে নৌকা না যায় তা নয়, তবে নানা অসুবিধা আছে। খালের ধারে ডিষ্ট্রিক্ট

বোর্ডের অবহেলিত অনাদৃত রাস্তাটা যেখানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেখানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়টির নাম মানসময়ী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। সাইনবোর্ড লেখাটা এত অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে একটু মনোযোগ সহকারে না দেখ্‌লে অজানা লোকের পক্ষে 'পাঠোদ্ধার করা সত্যই কষ্ট-সাধ্য, অনেক করে চেষ্টা করলেও প্রতিষ্ঠার বৎসর বোঝা যায় না। বিদ্যালয় গৃহটি দ্বিতল, কিন্তু সংস্কারের অভাবে এমন অবস্থা হয়েছে যে দেখলেই মনে হবে যে শের খাঁ বা তারও আগে কোন বাদ্‌শাহের আমলে তৈরী এই বিদ্যালয়। মা স্বরসতী যে আজও এখানে আনাগোনা করেন এ তাঁর নিতান্তই উদারতা ও নিরহঙ্কার মনের পরিচয় বলতে হ'বে। ইঁট চুরি করে করে প্রাচীরের এমন অবস্থা করেছে—এখানে যে কোন কালে প্রাচীর ছিল এটা প্রথমে বিশ্বাস হয় না। দক্ষিণ দিকে খেলার মাঠের প্রান্তে দু'পাশে জীর্ণ দুটো থাম দেখে মনে হয় এইখানেই একটা গেট ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় এদিকে লোকজনের যাতায়াত কিছু কম।

গ্রামের মধ্যে রাস্তা সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও উঁচু হয়ে খানিকটা গিয়ে আবার কোন্ পুকুরের পাড়ে গিয়ে খানিকটা নীচু হয়ে গেছে। মুখুয্যেবাড়ীর নিকটেই ঘন আগাছার জঙ্গলের পাশে রাস্তাটা যেন অকস্মাৎ হারিয়ে গেছে। বিদেশী লোকেরা এসে মাঝে মাঝে আপনমনে মন্তব্য করেন—এখানে যে মানুষ বাস করে তাত বিশ্বাস হয় না। যাদের বাড়ীর কাছে

এই রাস্তা সে মানুষগুলোর কি কোনো চোখ আর রুচি নাই নাকি? না ইচ্ছে করেই এই জঙ্গল করে রেখেছে—যাতে খুন-জখম আর লুট করা চলে ; ইত্যাদি ইত্যাদি। মুখুয্যেবাড়ীর উঠ্‌তি বয়সের ছোকরারা অচেনা পথিকদের মন্তব্য শুনে হাসে আর কায়দা করে করে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুখভঙ্গীমার সঙ্গে অস্ফুট এক শব্দ করে। তার অর্থ এই—তোমাদের মন্তব্যে মুখুয্যেদের কিছুই যায় আসে না।

গ্রামের বাজার তলার পঞ্চাশ ষাট হাত দূরে বাড়ুয্যেদের কাছাড়ীবাড়ী। কাছাড়ীবাড়ীর পরেই একটা প্রকাণ্ড বাগান—বাগানের চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা। বাগানের পরেই জমিদার রামতনু বাড়ুয্যের ভিতরবাড়ী। এদিক দিয়ে জমিদার, আর জমিদার কর্ম্মচারী বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া আর অন্য লোকের যাতায়াত নিষিদ্ধ। কাছাড়ীবাড়ীর পাশ দিয়ে জমিদারবাড়ীর দিকে একটা চওড়া রাস্তা চলে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ লোকেরা জমিদারবাড়ীতে যায়। প্রবেশ-পথের মুখে জমিদারদের গৃহ-দেবতার মন্দির—রাধাশ্যামের যুগলমূর্ত্তি, হারিয়ে যাওয়া দিনের প্রেম ভালবাসা আর মিলনের মূর্ত্ত বিগ্রহ যুগল রাধাশ্যাম। ভিতরে বিরাট দালান—দুর্গাপ্রতিমা পূজার বাধা মণ্ডপ। যুগলমূর্ত্তি পূজার জন্যে পুরোহিত নাপিতের মাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। বাড়ুয্যেবাড়ীর পরিচয় বল্‌তে জমিদার রামতনু বাড়ুয্যেরই পরিচয়। বহু-দিনের জমিদার, প্রতিপত্তিও কম নয়। রামতনুবাবুর একটি স্ত্রী,

একটি ছেলে ও একটি মাত্র মেয়ে। ছেলেটি গ্রামের সর্ব্বজন-পরিচিত নাম বংশী। ২৪।২৫ বৎসরের ছোকরা, আভি-জাত্যের যা ছাপ ছিল তা যাত্রাদলে মেতে আর অসম্ভব রকম ধূমপান করে হারিয়ে ফেলেছে। পড়াশোনা করেছিল—বাড়ীতে মাষ্টারও ছিল প্রায় প্রতি বিষয়ের জন্যে একজন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, মা সরস্বতীর পছন্দ হোলো না এই জমিদার তনয় বংশীকে, তিনি তাকে ম্যাট্রিক পাশেরও সুযোগ দিলেন না। জমিদারের ছেলে জমিদারের স্কুলে পড়তো, শিক্ষকমহাশয়গণ রুটির দায়ে প্রতি বছরই বংশীকে ওপরের শ্রেণীতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার করে দেওয়ার অধিকার তাঁদের হাতে সোজাসুজি না থাকায় বেচারী বংশীধারী দরজার পাশেই থেকে গেল। রামতনুবাবু অনেক চেষ্টা করেছিলেন যদি ছেলেকে কোন রকমে দরজা পার করানো যায়। কিন্তু ছেলের ধনুর্ভঙ্গ পণ সে আর একজামিন দেবে না। তার ধারণা লক্ষ্মী আর সরস্বতী এক বাড়ীতে বাস করতে পারে না। যদি সরস্বতীকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তা হলে বহুদিনের লক্ষ্মী সরে পড়তেও পারে। কি দরকার বাবা সে ঝামেলার, লক্ষ্মী তো খারাপ মেয়ে নয়। যার প্রতি তার করুণা পড়ে তার কিছুই আটকায় না। যুগ যুগ ধরে সে বাড়ীতে থাক্‌লেই হ'বে, তার শুভদৃষ্টি থাক্‌লে সরস্বতীর বহু বরপুত্র বাড়ীতে গোলাম হয়ে থাক্‌বে। ওই তো নায়েবমশায় সেকালের এন্‌ট্রান্স অর্থাৎ একালের বি-এর সমান। তিনি তো এই বাড়ুয্যেবাড়ীতে

চাকুরী করেন, এ কি সরস্বতীর কৃপা না লক্ষ্মীর জোর। যা হোক বংশীকে কিছুতেই রাজী করানো সম্ভব হোলো না। এমন কি তাকে লোভ দেখানো হয়েছিল যে পরীক্ষার হলে বসে যা হয় লিখে খাতা দিলেই তার পাশ হয়ে যাবে। সে ব্যবস্থাও নাকি তিনি কি ভাবে করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বংশী তাতে রাজী হোলো না। রামতনুবাবুর একটি মাত্র কন্যা শান্তিলতা। এক মাত্র পুত্র বংশীই সমস্ত সম্মান ও সম্পত্তির একক উত্তরাধিকারী। একমাত্র পুত্র সেই যখন মানুষ হোলো না তখন কন্যা শান্তিলতা কি তাঁর সে আশা পূরণ করতে পারবে? এ কল্পনাতীত দুরাশা রামতনুবাবুর মনে কোন দিনই জাগে নি। কিন্তু এমন অনেক কিছু ঘটে যা মানুষের কল্পনার বাইরে। অলক্ষ্যে থেকে যিনি সব কিছুই চালনা করেন তিনিই একদিন রামতনুবাবুর একমাত্র কন্যা শান্তিলতাকেও আপন পথে চালালেন। শান্তিলতা প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে একেবারে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বস্‌লো। রামতনুবাবু পুত্রের পরাজয় আর কন্যার জয়ে ঠিক খুসী হলেন বলে মনে হোলো না। যা হোক অচলাময়ীর জিদে মেয়েকে কলকাতায় রেখে কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হোলো। গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়েই মামার বাড়ী, শান্তিলতা সেই-খানেই থেকে স্কটিশচার্চ্চ কলেজে পড়বে ঠিক হোলো। অচলা দেবী কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না যে মণ্ডল বাড়ীর বীরেন কলেজে পড়ে ডাক্তারী পাশ করবে আর তারা জমিদার হয়েও

তার বাড়ীর ছেলে পাশ করবে না। তাই পুত্র বংশী যখন তার সে কল্পনাকে ভেঙ্গে দিল তখন অচলা দেবী কন্যা শান্তি-লতার মারফতে তাঁর সে আশা পূরণে বদ্ধপরিকর হ'লেন। রামতনুবাবুর এতটা বাড়াবাড়ির ইচ্ছা ছিল না। তিনি কন্যাকে একটি সুপাত্রে দানের ব্যবস্থা করবেন মনে মনে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু অচলা দেবী সে কথা কানেও তুল্লেন না। মণ্ডলদের শিক্ষার দাম্ভিকতা ভাঙতেই হ'বে এই তাঁর পণ।

রামতনুবাবু যে শান্তিলতার আর লেখাপড়াকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করতেন না তা টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। রামতনুবাবু স্ত্রীকে নাম ধরেই ডাক্‌তেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বিদ্রূপের স্বরে বললেন —"কি গো অচলা দেবী তোমার মেয়ে যে একেবারে সরস্বতী, পরীক্ষা দেওয়া যে একেবারে পাশ হ'য়ে যাওয়া—তাও আবার First Division-এ।" অচলা দেবীও শ্লেষ বুঝলেন—"তা তো নিশ্চয়, ছেলেরা পাকামো করে বেড়াবে তো পাশ করবে কি করে? "ছেলের মাথা ত তুমিই খেয়েছ।" হঠাৎ রামতনুবাবু চটে উঠলেন। অচলা দেবী গম্ভীর ভাবে বললেন—"তা বৈকি।" বাড়ীর ঝি খেঁদির মা উঁকি দিয়ে চলে গেল। কর্ত্তা-গিন্নির এই ধরণের বাদানুবাদ শুনে শুনে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রামতনুবাবু—অকারণে "যত সব" বলে স্থান ত্যাগ করলেন।

বংশী এতক্ষণ চুপ করে খাচ্ছিল। শান্তিলতা অদূরে বসে

সেলাই করছিল। বংশী হঠাৎ মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—মায়ের দু'টি দু'অবতার, একটি খোঁড়া অবতার, আর একটি সাক্ষাৎ সরস্বতী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে শান্তিলতাকে দেখিয়ে দিল। শান্তিলতা ব্যঙ্গোক্তিকে আরও বিকৃত করে উত্তর দিল—"একটি লোভী, অপদার্থ, মায়ের আঁচলে বাঁধা আর একটি মায়ের আঁচল ছেড়ে।" অকস্মাৎ বংশী চিৎকার করে ওঠে "দেখ শান্তি মুখপুড়ি একটু সম্মান রেখে কথা বলিস্, জোচ্চুরি করে একটা পাশ করে তোর এত দেমাক্। মেয়েদের আবার পাশ! বরং তোদের মত সুবিধে পেলে আমরা এক একটা পরীক্ষাতেই তিনটে ক'রে পাশ করতে পারি। নাম দেখিয়ে তো পাশ কর—কুমারী শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়! বাবা এ নাম আর পছন্দ হ'বে না? হ'তেই হবে—ওমনি ত নম্বরের জায়গায় প হ'য়ে গেল।" শান্তিলতা আদৌ রাগ না করে বললো—"আচ্ছা দাদা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তা হ'লে দু'রকম ডিগ্রি পাওয়া যায়, একটি পুরুষদের—যেমন তুমি পেয়েছ। আর একটি মেয়েদের, তোমার বুদ্ধি বটে!" বাবা মায়ের আলাপ আর বাক্‌বিতণ্ডার জের ধরে বংশী আর শান্তি যে কতদিন এমনি ঝগড়া করেছে তার হিসাব নাই।

গ্রামের মধ্যে আর একটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের কথা আশে-পাশের দু চারখানা গ্রামের সবাই জানে। শশাঙ্ক মণ্ডলের নাম জানে না এ অঞ্চলে কম লোকই আছে। বীরেনের বাবা শশাঙ্কবাবু চিরদিন জনহিতকর কাজের সঙ্গে জড়িত থাকায়

তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। তার মত সহৃদয় ব্যক্তি এ অঞ্চলে বিরল। অর্দ্ধ কর্ম্মজীবন তিনি কলকাতায় কাটান। বি-এ পাশ করার পরে তিনি একটি বিশিষ্ট দেশী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁর দেশের জমি জায়গা যা ছিল তা থেকেই তাঁর বেশ চলে যেত। কিন্তু ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্যে এবং কংগ্রেসী আন্দোলনের একটা অভিজ্ঞতা লাভের আশায় তিনি কলকাতায় থাকা ঠিক করেন। ভগবান তাঁকে বেশীদিন চাকুরী করতে দিলেন না। তিনি অন্য বন্ধুর সংগে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলেন। একদিন লবণ আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে তাঁকেও কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হোলো। সেদিন তাঁর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিনী জ্ঞানদাময়ীকে ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রামেই থাকতে হয়েছিল। তাতে জ্ঞানদাময়ীর বিশেষ অসুবিধা হয় নি। জনকল্যাণে, দেশমাতৃকার মুক্তির আশায় তাঁর সুযোগ্য স্বামী কারাবরণ করেছেন এটা কল্পনা করেও জ্ঞানদাময়ী আনন্দ পেতেন। ঐ গ্রামের বাড়ুয্যে মুখুয্যের দল যারা সরকারী চাকুরী-লব্ধ অর্থে সাধারণতঃ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে তারা সেদিন শশাঙ্কবাবুকে বোকা বলে অভিমত প্রকাশ করেছিল। বি-এ পাশ করেও হতভাগ্যের মত যে জেলে গেল তাঁর মতি স্থির নাই বলে তাঁরা প্রচার করলে। জ্ঞানদাময়ী কিন্তু নির্ভয় নির্ব্বিকার। ওপাড়ার পানু বাগ্দী খুবই বিশ্বাসী লোক। বাগ্দী পাড়ার অশিক্ষিত মানুষ হলেও, মনুষ্যত্বে তার হৃদয় ছিল ভরা। মণ্ডলবাড়ীর অসহায়

অবস্থা তাকে ব্যথা দিত ; সে একদিন এসে জ্ঞানদাময়ীকে বলে গেল—"মা কিছু ভাববেন না। পানু যতদিন আছে আপনার কোন ভয় নেই, খেতের ফসল গোলায় ভরে দিয়ে যাব।" সত্যি যতদিন শশাঙ্কবাবু জেলে ছিলেন পানু তার আপ্রাণ চেষ্টায় শশাঙ্কবাবুর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল।

শশাঙ্কবাবুর তিন পুত্র এবং এক কন্যা বিরাজময়ী। বড় ছেলে গজেন্দ্র বি-এ পাশ করে গ্রামেই থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে গজেন্দ্রও ভেসে গিয়েছিল। তারও বরাতে কারাভোগ বাদ পড়ে নি। পিতার প্রথম সন্তান হিসাবে গজেন্দ্র যেন নিখুঁত ভাবে পিতাকে অনুসরণ আর অনুকরণ করেছিল। বংশের জ্যেষ্ঠ হিসাবে পিতা শশাঙ্কবাবু যে কয়েকবার বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন গজেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্গে তার বিবাহে অনিচ্ছার কথা পিতাকে জানিয়েছে। দেশসেবার অজুহাত ছাড়াও বিয়ের ব্যাপারে গজেন্দ্রনাথের শারীরিক বাধা ছিল। ছেলে বয়সেই তাকে প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হ'তে হয়। ডাক্তারদের সুচিকিৎসায় গজেন্দ্র সেরে ওঠে, কিন্তু নিজের শরীর সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। সেইজন্যে সে কোনো দিনই চাইত না যে একটি কল্পনাময়ী কুমারীকে জীবনে জড়িয়ে তার সকল কল্পনাকে নষ্ট করে দেয়। ঠিক সেইজন্যে গজেন্দ্রনাথ সাবধানতার সঙ্গে প্রতিবারই বিয়ের প্রস্তাবকে এড়িয়ে গেছে।

যা হোক্ বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবুর পুত্রবধূর সখ মধ্যম পুত্র হরেন্দ্রই পূর্ণ করেছে। মধ্যম শিক্ষিতা পুত্রবধূ যোগমায়া প্রয়োজনীয় মাধুর্য্য, সেবার দক্ষতা এবং কৃষ্টি নিয়েই মন্ডল-বাড়ীতে এসেছিল। শ্বশুরবাড়ীতে প্রথম পদার্পণ করার দিন থেকে যোগমায়া আপন অন্তরের মাধুর্য্যে ছোটবড় সবার অন্তর জয় করেছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই সংসারের সকল কাজকর্ম্ম একদম নখদর্পণে লক্ষ্য করেছিল। মায়ার ব্যবহারে বৃদ্ধ শশাঙ্ক বাবু এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তার সঙ্গে নিজের কন্যার মত ব্যবহার করতেন। তিনি আদর করে তাকে ডাকতেন—"যোগী মা"। দৈনন্দিন জীবনের টুকরো ঘটনা থেকেই যোগমায়ার সেবারত মনের পরিচয় বৃদ্ধ পেয়েছেন—মুগ্ধ হয়েছেন। সেদিন সকালে বাজারের থলে হাতে শশাঙ্কবাবু আনাজপত্রের হিসাব করতে করতে বেরুচ্ছিলেন, এমন সময়ে যোগমায়া একটা ডিসে করে বেল পোড়া আর কিছু চিনি নিয়ে এসে হাজির হোলো। শশাঙ্কবাবুকে বাহিরে যেতে দেখে বললো—"এ কি বাবা আপনি এত সকালে কিছু না খেয়ে যে চলে যাচ্ছেন?"

"তাই তো,—ভুল হয়ে গেছে মা।" হেসে বৃদ্ধ পুত্র-বধূর হাত থেকে ডিস্‌টা নিয়ে পাশে রকের ওপর বসে পড়লেন। যোগমায়া হেসে শ্বশুরের হাতে গ্লাস থেকে জল ঢেলে দিলেন। ইতিমধ্যে কন্যা বিরাজময়ী পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। শশাঙ্ক-বাবু কন্যা ও পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"দেখ মা,

তোমরা দুজনেই শুনে রাখ—এতে তোমাদের ভবিষ্যতে কল্যাণ হ'বে।" একটু করে বেল পোড়া চিনিতে চুকিয়ে নিয়ে মুখে পুরে বৃদ্ধ শশাঙ্কশেখর বলতে চেষ্টা করলেন—"দেখ—দে—খ মা।" খেতে খেতে কথা বলার অসুবিধা হচ্ছে লক্ষ্য করে বিরাজ বললো—"বাবা খেয়ে নিয়ে বল না।" এতক্ষণে বৃদ্ধের খাওয়া শেষ হয়েছিল, বললেন—"এই বলছিলুম কি কখনো এমন কাজ করবে না যাতে করে মানুষ তোমার মৃত্যুর পরে সুখ্যাতি না করলেও যেন নিন্দা না করে। ক'দিনের জন্যেই বা পৃথিবীতে আসা, তবে দুটো ভাল কাজ করে যাই না কেন? পরের কষ্ট হয়, পরে নিন্দা করে এই ধরণের কাজ কেন করবো বল? মানুষেরা এ সত্য কিছুতেই বুঝবে না। কিন্তু মা তোমাদের বলি জীবনে প্রতিজ্ঞা কোরো যেন ভাল হয়ে দিন কাটাতে পার।" কথাগুলি পাশের ঘরের দুই পুত্রের কানেও গেল। শশাঙ্ক-বাবুর এই ধরণের উপদেশ এই প্রথম নয়, তিনি প্রায়ই পুত্রদের কাছে এই রকম কথা বলে থাকেন। পিতার উদ্দেশ্যে নীরবে প্রণাম করে জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্দ্ধসমাপ্ত পুস্তকে মন দিলেন। কিন্তু মনটা তার চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। হঠাৎ তার জীবন পোদ্দারের কথা মনে পড়লো। সারা জীবন সুদের হিসাবে সে হতভাগা খাতা ভর্ত্তি করে গেল। কিন্তু সে কার জন্যে? তার মৃত্যুর পরে ত বহুলোক প্রকাশ্যে বলেছে—"মরেছে না আপদ গেছে!" দুঃখ হোলো জীবন পোদ্দারের জন্যে। গজেন্দ্র কি ভেবে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পিতার পায়ের ধুলো নিল। বৌমা

যোগমায়া মাথার কাপড় সামনের দিকে টেনে দিয়ে সরে দাঁড়াল। বিরাজ বিস্ময়ে দাদার মুখের দিকে তাকালে শশাঙ্কবাবু পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন—"গজেন, বিরাজের বিয়ের একটা ব্যবস্থা কর না বাবা।" বিয়ের কথা শুনে লজ্জিত বিরাজ দূরে দণ্ডায়মানা বৌদিকে নিয়ে সরে পড়লো : এই রকম ঘটনা প্রায়ই হ'য়ে থাকে। হাল্কা হাসিখুসীর মধ্যে সুখের সংসারটি শান্তিতে বেশ কাটে। সচ্ছলভাবে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করার সব কিছু দিয়েই ভগবান শশাঙ্কবাবুকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। উপযুক্ত যোগ্য পুত্র, যোগ্য পুত্রবধূ, আর অনূঢ়া কন্যার বিয়ের দুর্ভাবনা সবই বৃদ্ধ শশাংকশেখরের বরাতে বিদ্যমান ছিল। বহুলোকেই তার সৌভাগ্যকে হিংসা করতো।

মেজাজটা অত্যন্ত রুক্ষ হয়েছিল। অচলাময়ীর ব্যবহার, আর পথে বংশীর রসিকতা ও মিথ্যা উক্তি সব মিলে যেন বীরেনের স্বাভাবিক হাসিখুসী ভাবটিকে অপহরণ করে নিয়েছিল। তাই যখন সে বাড়ীতে প্রবেশ করলো তার দেহ ও মন ক্লান্ত ও অবসন্ন মনে হোলো। কোনো দিকে লক্ষ্য না করে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শ্রান্ত শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিল। স্নান-খাওয়ার কথা একদম ভুলে গেল।

হঠাৎ বিরাজ দাদার ঘরে এসে হাজির হোলো, সে এসেছিল চুপি চুপি দাদার সদ্য আনা নভেলখানা নিয়ে যাবে ভেবে। অসময়ে

দাদাকে শুয়ে থাকতে দেখে—বিস্মিত ভাবে বললো—"কি দাদা তুমি যে চান-খাওয়া না করে শুয়ে আছ, ব্যাপার কি? শরীর ভাল আছে তো?"

বিরাজের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বীরেন জিজ্ঞাসার সুরে বললো—"কে রে বিরাজ?"

"হ্যাঁ দাদা, তা ওঠ স্নান ক'রে এস। সেই যে সকালে বেরুলে আর তো ফেরবার নামটি নাই। আমরা ভাবলুম, বাড়ুয্যে-দের পুজোবাড়ীতে গেছ হয়ত খেয়েই আসবে। কিন্তু কৈ তার তো কোন লক্ষণই দেখ্‌ছি না। নাও, ওঠ—তাড়াতাড়ি, চান করে এস।"

ফিরে শুয়ে বীরেন বললো—"তুই একটা কাজ করবি? চট্‌ করে এক কাপ চা খাওয়া দেখি!"

"দুপুর বেলা চা খাবে?"

"দেখ বিরাজ, বিরক্ত করিস্‌নে, এখন এক কাপ চা দিবি তো দে—না হলে ভাগ—আমি একটু ঘুমিয়ে নেই।"

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে বিরাজ বলে—"আচ্ছা আমি চা আনছি, কিন্তু তুমি দয়া করে ঘুমিয়ো না।" বিরাজ জানতো এবাড়ীর ছোট ছেলের কি আদর, সুতরাং ভর-দুপুরে তার পক্ষে এক কাপ চা চাওয়া আর পাওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। বিরাজ আর কথাবার্ত্তা না বলে চায়ের জন্যে চলে গেল।

বীরেন পড়াশোনা নিয়ে বিদেশে কাটিয়েছে। দেশে এসে জনসেবা আর ক্লাব নিয়ে মেতেছে, বাড়ী আর বাড়ীর মানুষের

দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে তাকানোর অবকাশ তার হয় নি। আজ হেমন্ত দুপুরে যেন সে বিরাজকে নূতন করে আবিষ্কার করলো। বীরেনের যেন হঠাৎ মনে হোলো—বিরাজ অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। রং ছাড়া ভগবান বিরাজকে সবই দিয়েছেন, কি সুন্দর গঠন, চোখ, নাক কি নিখুঁত. সব চেয়ে সুন্দর ঐ বিরাজের ঘনকালো কোঁকড়া চুল। হঠাৎ যেন বীরেন চিন্তিত হয়ে ওঠে। কে জানে কার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে? সে কি নিবিড় ভাবে ভালবাসবে এই বিরাজকে? বাইরের রং দিয়ে যদি সে বিচার করে তা হলে বিরাজের ওপর একটা অবিচার হয়ে যাবে। ভাবপ্রবণ বীরেন ভাবে—নারীরা কত না অসহায়। যার গলায় মালা দুলিয়ে দেবে সেই ওর সব অধিকার হরণ করে নেবে। নারী প্রগতি বীরেনের কাছে একটা কথার কথা। শান্তিলতা তো কলেজে পড়া মেয়ে। সেও কি মনের মত কাউকে বেছে নিয়ে বিয়ে করতে পারবে? বীরেন শিহরিত হয়ে ওঠে, অবচেতন মনে যেন কোথায় কি ক্ষীণ আশা জাগে।

বীরেনের মনে পড়ে শশাঙ্কবাবু সেদিন গজেন্দ্রকে বিরাজের পাত্র সন্ধানের কথা বলেছিলেন। বীরেনের মনে পড়ে এক বন্ধুর কথা। তরুণবাবু বলে যে ছেলেটি তার সঙ্গে এই গ্রামের মহামারীর সময় সেবা করতে এসেছিল তার পাশে বিরাজকে মনে মনে কল্পনা করে বীরেন কি রকম খুসী হয়ে ওঠে। তরুণের যেন ভাল লেগেছিল বিরাজকে, কলকাতায় ফিরে গিয়েও তরুণ তো কতদিনই প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে বিরাজের সেবা-

পরায়ণতা, কর্ম্মদক্ষতার আর মিষ্টি স্বভাবের প্রশংসা করেছে। এই তো সেদিন হঠাৎ তরুণ বললো—চল-হে বীরেন আর একবার তোমাদের গ্রামে যাই, বেশ লাগে তোমাদের গ্রাম। সে বেশ লাগাটা কি কেবল আমাদের এই জীর্ণ হরীশপুরকে না তার সঙ্গে কুমারী বিরাজময়ী মণ্ডলকে। আর একদিন যেন তরুণ বলেছিল—দেখ বীরেন তোমার বোনের নামটা কিন্তু বড় সেকেলে ধরণের, একটা যেন প্রস্তাবও করেছিল নাম পরিবর্ত্তনের, বলেছিল "বি" থাক, ওটাকে আধুনিক ধরণের করে বীথি কর না কেন? সে কি তরুণের দুর্ব্বলতা না সারল্যের নিদর্শন? কিন্তু কে যেন সহসা চাবুক লাগিয়ে বীরেনকে স্মরণ করিয়ে দিল—তরুণ তো জাতিতে কায়স্থ। বীরেনের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু শশাঙ্কবাবু কি এতে সম্মতি দেবেন? বীরেন তার দাদার মনোভাব জানতো—সেইজন্যে তাদের সম্বন্ধে কোনো ভাবনা নাই। যত গোলমাল মা আর বাবাকে নিয়ে। কিন্তু বাবা ত আদর্শবাদী মানুষ, তাঁর আদর্শের কাছে কি মানুষের প্রাণের আকুলতা স্বীকৃতি পাবে না? যদি কোন দিন শান্তির কাছ থেকে সম্মতি মেলে তা হ'লে তরুণ তো তাকে জীবনে গ্রহণ করে ধন্য হ'য়ে যাবে। কিন্তু সেদিন কি সম্প্রদায়ের প্রাচীর তাদের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে তাদের প্রাণের অনন্ত প্রেমকে অস্বীকার করবে? সহসা অচলা দেবীর অশোভন ব্যবহার বীরেনের মনে পড়ে গেল।

চায়ের কাপ নিয়ে বিরাজ ঘরে ঢোকে। হেসে বীরেন বলে

স্মৃতি

"কি রে এত তাড়াতাড়ি তুই কি করে চা করে ফেল্‌লি রে?" "ও! না হয় একটু দেরীই হয়েছে তার জন্যে এত ঠাট্টা কেন? ওঠ, লক্ষ্মী ছেলের মত চা খেয়ে চান করে এস দেখি।" বিরাজ কাগজ সরিয়ে টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রেখে বীরেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বীরেন তাড়াতাড়ি উঠে চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে চায়ে এক চুমুক দিয়ে, অস্ফুট "আঃ" শব্দে চায়ের সুন্দর প্রস্তুতির স্বীকার করে। বিরাজের দিকে তাকাতেই বিরাজ হেসে বলে "কি দাদা, চাটা কি ভাল করতে পারি না? তোমাদের কলেজের হোষ্টেলে" থাম্‌ আর বলিস্‌ নি তুই, হোষ্টেলের ঠাকুরটিকে কত দিনই বলি—বাবা তো তোমার হাতে আমার জীবনটাকে তুলে দিয়ে গেছেন, দয়া করে রক্ষা করবার ব্যবস্থা কোরো। বেটা বকশিস্‌ পেলেই খাতির করে। আর না পেলেও যেটুকু করে সেটা—পাওয়ার লোভে। যাক্‌ একটা কথার উত্তর দে দেখি?" "ওসব উত্তরটুত্তর আমার দ্বারা দেওয়া চল্‌বে না। ও-তোমার বন্ধুরা আর তুমি ভাল বোঝো। সেবাটেবার কথা তো বল্‌বে ওবিষয়ে তোমার বন্ধু তরুণবাবুই যোগ্য ব্যক্তি, তার সঙ্গেই আলোচনা কোরো।" এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলে ফেলে, বিশেষ করে কথার মাঝে দাদার বন্ধু তরুণের নামোচ্চারণ করে বিরাজ লজ্জিত হয়ে পড়লো।

বীরেন বললো—"থাম থাম, কি বলি না শুনে তুই দীর্ঘ বক্তৃতা সুরু কর্‌লি।"

"ও থাক দাদা, তুমি এখন চান সেরে এস দেখি পরে

তোমার কথা শুনবো। সাবান, তেল ঐ বারান্দায় রাখা আছে। চট্ করে এসো কিন্তু, তোমার জন্য আমাদের খাওয়া হয় নি মনে থাকে যেন।" আর কথা শুনবার অপেক্ষা না করে বিরাজ তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দেরী করাটা অত্যন্ত অশোভন হবে এবং হয়ত বৌদি যোগমায়া এসে নানা রসিকতায় ব্যস্ত করবে ভেবে বীরেন স্নানের উদ্দেশ্যে বাইরে গেল।

শান্তিলতার সঙ্গে বীরেনের পরিচয়টি কেমন যেন আকস্মিক এবং পরিচয়ের পরিবেশ আর উপলক্ষ্যটাও যেন অবিশ্বাস্য। কিন্তু তবুও তো সত্য। হরীশপুরের মজে যাওয়া খালের ধারে শান্তিলতার সঙ্গে তারই আগ্রহে প্রথম আলাপ। অঙ্ক শেখার অছিলায় দিনের পর দিন ধীরে ধীরে মন আকর্ষণের চেষ্টা সবই যেন স্বপ্ন। বীরেন ভাবে যৌবনের দেবতা বোধ হয় তার প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্যে যুগ যুগ ধরে তপস্যা করে এসেছে, নইলে তার মত আদর্শবাদী, শক্ত ছেলে কি করে শান্তিলতার সঙ্গে পরিচিত হলো ; শুধু পরিচয় নয় দু'জনে যেন দু'জনকে অন্তরে গোপনে বরণ করেছে। যৌবনে নারীর পক্ষে প্রকৃতির কাছে যা লভ্য শান্তিলতার তা সবই ছিল, সুতরাং প্রকৃতির গতানুগতিক নিয়মে শান্তিলতা যে বীরেনের মনে ছাপ ফেলবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। শান্তিলতা যৌবনের সমস্ত পাওনা লাভ করেছিল। একটা জিনিষ সে অস্বীকার করতো সেটা তার অহেতুকী লজ্জা। সে নর ও নারীর মাঝের

ব্যবধানটাকে কোন দিনই বড় করে দেখে নি। সংরক্ষণশীল বাড়ুয্যে পরিবারের মধ্যে জন্মে এবং বড় হয়েও সে তার এই বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখবার চেষ্টা করতো। লজ্জা দিয়ে লজ্জা ঢাকার প্রকৃতিকে শান্তিলতা লুকোচুরি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতো না। তার মনে হোতো শাশ্বত যা, তা স্বীকার করাই ভাল, সত্যকে অস্বীকারের প্রবৃত্তি দুর্ব্বলতারই প্রকাশ।

বীরেনের বৌদি অর্থাৎ যোগমায়া আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হ'লেও আধুনিক ঠাকুরপোদের সঙ্গে আধুনিক ভাবে সর্বদিক বজায় রেখে মেলামেশা ও আলাপ আলোচনার দক্ষতা তাঁর ছিল। বীরেন বৌদির খুব ভক্ত হ'য়ে উঠেছিল একটি কারণে—সেটি হচ্ছে বৌদির মধ্যে মার্জ্জিত আভিজাত্যের প্রকাশ। যোগমায়ার মধ্যে চাঞ্চল্য ছিল—উদ্দামতা ছিল কিন্তু সে সব মানানসই। মেডিকেল কলেজের ছাত্র হওয়ায়, আধুনিক অতি আধুনিক. বাঙালী অবাঙালী বহু মেয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ বীরেনের হ'য়েছে, কিন্তু ঠিক বৌদির মত কাউকে সে আবিষ্কার করতে পারে নি। যোগমায়া যখন বৌদি হয়ে আসেন নি, বীরেন তখন হঠাৎ দেখা আধুনিকাকে বৌদির আসনে কল্পনা ক'রেছে। আনন্দ পেয়েছে, কিন্তু সত্যকার বাস্তবরূপ নিয়ে যোগমায়া যখন এলেন তখন বীরেন তার অতীত কল্পনা আর বর্ত্তমানের বাস্তবের সঙ্গে একটা বিরাট ব্যবধান লক্ষ্য করে আনন্দিতই হোলো। তার কল্পনার বৌদি তার বাস্তবের বৌদির কাছে ম্লান হ'য়ে গেছে। কলেজ

হোষ্টেলের একঘেঁয়ে দিনগুলি থেকে চুরি করা দু'চারটি দিন সে বাড়ীতে এসে কাটায় মা, বাবা, দাদা, বৌদির আদর যত্নে সারা বছরের ক্লান্তি ভুলে যায়। বৌদি ঠাট্টা করে প্রায়ই বলে—"ঠাকুরপো আর একলা ভাল লাগে না ভাই—একটি সংগী চাই।" বীরেনও রসিকতা করে বলে "দাদার সংগ কি এরই মধ্যে ক্লান্তি এনে দিল না কি বৌদি?" যোগমায়া ইংগিত বোঝেন, বলেন—"আমার রান্নাঘরের সংগী চাই—আমি যে সংগীর কথা বলছি—সে আমার পুকুর ঘাটে চান করতে যাওয়ার সংগী, সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ-জ্বালার সংগী। বীরেন ইংগিত বোঝে, কিন্তু আলোচনাকে দীর্ঘ ও উপভোগ্য করার উদ্দেশ্যে বলে—"কেন বিরাজ কি তোমাকে সে সংগ দিতে পারছে না?" সংগে সংগে চিৎকার সুরু করে—"বিরাজ—ও বিরাজ," বিরাজ পাশের জানালায় পা ছড়িয়ে আপন মনে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে সেলাই করছিল; দাদার হাঁক ডাকে ব্যস্ত হয়ে আসে। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকে দাদার মুখের দিকে, বৌদি মুচকি হাসেন। বীরেন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে—"হ্যাঁরে বিরাজ, তুই নাকি বৌদির সংগে ওঁর চান-খাওয়া আর প্রদীপ জ্বালায় সাহায্য করিস না?" বিরাজ বিস্মিত হয়, বলে "কেন, বৌদি বুঝি তোমার কাছে নালিশ করেছে?" "হ্যাঁ করেছে," বলে বীরেন গম্ভীর ভাবে চায়ের কাপে আর একটি চুমুক দেয়। যোগমায়া বিরাজের অসহায় অবস্থা দেখে হো হো করে হেসে ওঠেন, বিরাজ চমকে ওঠে। বীরেন চা শেষ করে আবার সুরু

করে—"দেখ বিরাজ, বৌদি ঠিক তোর নামে নালিশ করে নি, বলছিল—তার একজন সঙ্গী চাই। তুই-ই বল তুই তো বাড়ীতেই আছিস্, সুতরাং তার সঙ্গীর অভাব কোথায়?" এতক্ষণে বিরাজ অবস্থা বোঝে—বৌদির দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হেসে উঠে বলে—"তা দাদা, এ ব্যাপারে আমি বৌদির সঙ্গে একমত। আমারও একজন নূতন সঙ্গী পেতে খুবই ইচ্ছা করে।" বীরেন চট্ করে বলে ওঠে—"ওঃ বুঝেছি, আচ্ছা বাবাকে আজই বলবো—তোর বর খুঁজতে।" বিরাজের মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। সে ভারাক্রান্ত স্বরে প্রতিবাদ জানায়—"বারে, আমি তাই বললুম বুঝি, যাও আমি তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বো না। যত সব।" বিরাজ প্রস্থানদ্যোগ করে। হাস্যময়ী যোগ-মায়া তার হাত ধরে বলে "আচ্ছা আমি বিচার করছি। সঙ্গীর কথা আমিই তুলেছিলুম—অতএব শেষ রায় দিচ্ছি আমি। ঠাকুরপোর মারফতে আসবে আমার দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্ম্মের প্রিয় সঙ্গিনী আর তোমার মারফতে যাকে পাব তার সঙ্গ মাঝে মাঝে পেলেই চল্‌বে।" বিরাজ বৌদিকে ধাক্কা দিয়ে সরে পড়ে। বীরেন চেয়ারে উঁচু হয়ে বসে যোগমায়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—"সাধু বিচারক! তোমার নিরপেক্ষ বিচারের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।" কিন্তু

"যত সাধ রবে সাধ্য রবে না
দিব গুনে গুনে রহিবে কামনা
পাবি কল্পনা রাশি রাশি"

বৌদি আঙ্গুল উঁচু করে শাসনের ভঙ্গীতে বলে—"আচ্ছা দেখা যাবে।"

এমনি ভাবে হাল্‌কা হাসিখুসীর মধ্যে দিয়ে কাটে মণ্ডল-বাড়ীর ছেলেমেদের দিনগুলি। বাহিরের লোক দেখে হিংসা করে ওদের।

বংশীর যাত্রারদল 'বংশী অপেরা'। জমিদার পুত্রের সখের প্রতিষ্ঠান, অর্থের লোভে নতুন অভিনেতা আসে, দু একটা আসরে যাত্রা করার পরেই ম্যানেজারবাবু স্বয়ং বংশীধারীর সঙ্গে গোলমাল হয়, তারা সরে পড়ে। পরবর্ত্তী অভিনেতা আমদানীর কালে বংশী বেশ জোর দিয়েই বলে "এবারে যাকে আনছি সে আগের চেয়ে ঢের ভাল, ভদ্র এবং দেখ্‌তে সুন্দর। রামচন্দ্রের ভূমিকায় এমনি না হলে কি যাত্রার দলে চলে? রাম আসার পরে যোগ্য সীতা খোঁজার পালা সুরু হয়। গোঁফ্‌ দাড়ি কামিয়ে যে দোহারা গঠনের ছোকরা এতদিন প্রায় নিখুঁত ভাবে সীতার ভূমিকায় অভিনয় ক'রে পাতাল প্রবেশের প্রাক্কালে গাঁয়ের বুড়ি ও তরুণীদের চোখ সজল করে ছেড়েছে সে সহসা কলকাতার নতুন গণেশ অপেরায় বেশী মাইনে পেয়ে চলে গেল। বংশী দুঃখ ক'রে তার তোষামুদেদের কাছে বল্‌তো—নিমক-হারামী আর কাকে বলে? ঘুরে ঘুরে বেড়াতো আমি নিয়ে এসে যাত্রার দলে একটা বড় পার্ট্‌ দিয়ে মানুষ করে তুললুম—শেষে কটা টাকার মোহে কলকাতায় সরে পড়লো। যাক্‌ না কলকাতায়, সেখানের ধাপ্পাবাজ মানুষগুলোকে তো চেনে না!

চোখের জল আর নাকের জলে যদি এক না করে ছাড়ে তো কি বলেছি। হরীশ খুড়ো তার এই কথায় সায় দেয় এবং তার মত এ হেন চালাক লোকও যে কলকাতার মানুষের পাল্লায় কি ফ্যাঁসাদে পড়েছিল তা অতি দক্ষতার সংগে অভিনয়ের ঢং এ বর্ণনা কোরে উপস্থিত সবার বিস্ময় সৃষ্টি ক'রে। যারা হরীশখুড়োর মোসাহেবী করে, তার মারফতে স্বয়ং ম্যানেজারকে খুসী করে একটা ভাল ভূমিকা পাওয়ার স্বপ্ন দেখে, তারা কোরাসের সুরেই বলে বসে—"এ কেবল আপনি বলেই সম্ভব হ'য়েছে, নতুবা অন্য কেউ হ'লেই ওবিপদ থেকে রক্ষা পেত না।"

সেদিন সন্ধ্যায় যাত্রার আখড়াতে উপস্থিত হ'য়ে এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার হরীশবাবুকে বংশী বললো—"বুঝলে হরীশখুড়ো, আজ বীরেন মণ্ডলটাকে খুব শুনিয়ে দিয়েছি। মদ খেয়ে চেহারাটা কি বিশ্রীই না করেছে, চুলগুলো রুক্ষ যেন কতকাল তেল মাখেনি। আমরা এত পরিশ্রম করি, রাত্রি জাগি, কিন্তু চেহারা কি বিগড়েছে? আচ্ছা হরীশকাকা, সেই যে তুমি বললে ওর সংগে কোন নার্সের না কার খুব আলাপ জমেছে? মদবিক্রেতার সাক্ষী মাতাল এটা আর যুক্তি তর্কের অবতারণা করে বোঝাতে হয় না। নোংরামো আলোচনায় হরীশখুড়ো বংশীর গুরুদেব। এমন আলোচনার সুযোগ পেয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করে বংশীর হাতে একটি দিয়ে নিজে একটা ধরালো। কায়দা করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—"খুড়ো, যদি তুমি বল তো বামাল সমেত তোমাকে দেখাতে পারি।"

বংশী ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট চেপে ধরে দু'হাত দিয়ে হরীশ-চন্দ্রকে জড়িয়ে বলে—"পা—র—বে খুড়ো?" "আলবৎ পারবো—" "কবে তুমি কলকাতা যাবে বল?" বংশী নিরুৎসাহ হ'য়ে উত্তর দেয় "কলকাতা গিয়ে দেখতে হ'বে? তা ছাড়া এখন গিয়েও তো লাভ নাই। বীরেনটা ছুটীতে বাড়ী এসেছে।" হরীশখুড়ো বলে—"আঃ খুড়ো নিরুৎসাহ হচ্ছ কেন, ওকে তো কলকাতায় যেতেই হ'বে।" বংশী প্রসঙ্গান্তরে যায়। নতুন যে নাটকটা আনা হয়েছে তাতে কি দিলে বইটাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলা যাবে সেই আলোচনা সুরু হয়। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন হারু—মানে সেই যে ছেলেটা সখি সাজে আর রাধিকার কিশোরী বয়সের অভিনয় কোরে সবাইকে তাক লাগায় সেই হারু। তাকে দেখেই বংশী বলে "এই হেরো কোথায় চলেছিস্—নিতাইবাবু এসেছে রে?" হারু তো খোদ মালিককে দেখে চমকে ওঠে; থমকে দাঁড়িয়ে ঢোক গিলে বলে—"এজ্ঞে এই আস্‌ছি, নিতাই-বাবু এখনো আসেন নি।" বেচারী হারু বিড়ি কিন্‌তে যাচ্ছিল—ধরা পড়ার ভয়ে তার বুক দুরু দুরু করে উঠলো। একবার মনে মনে মাকালীকে ডাকলো। হয়ত মাকালী তার কথা শুন্‌লেন। হারুকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করতেই সে এক দৌড়ে সড়ে পড়লো। বংশী হরীশখুড়োকে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

শান্তিলতার সঙ্গে বীরেনের মেলামেশার অশোভন ইঙ্গিত

যেটা তারই মায়ের মুখ থেকে গ্রামের অন্যান্য মেয়েরা শুনেছিল সেটাকে শাখা পল্লব বিস্তার ক'রে সারা গাঁয়ে এমন ভাবে প্রচারিত হোলো যে বাড়ুয্যে আর মন্ডলবাড়ীর মধ্যে যেন আবার একবার বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ভেবে গ্রামের অকেজো মানুষগুলো খুসী হোলো। কথাটা যখন শশাঙ্কবাবুর কানে গেল তিনি সেটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন ; কারণ তার পুত্রদের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল, তিনি শুধু বল্‌লেন—বীরেন আমার বড় হয়েছে—সত্যিকারের মানুষ হওয়ার সাধনাই তার সাধনা। আমি জানি সে এমন কিছু করবে না যাতে মানুষের অকল্যাণ হ'তে পারে। যারা কথাটা উত্থাপন করেছিল তারা আর আলোচনার উৎসাহ না পেয়ে চুপ করলো!

শান্তিলতার মা অচলাময়ী কিন্তু ব্যাপারটি নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করলেন। রামতনুবাবুকে ধরে বসলেন। "মেয়েকে কলকাতা থেকে আনিয়ে তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করতে হ'বে।" রামতনুবাবু কিন্তু সে কথায় বেশী গুরুত্ব আরোপ না ক'রে বল্‌লেন—"কেন, এত তাড়াতাড়ি তোমার সখ মিটলো? যদি মেয়েকে কলেজেই পড়ালে তো একটা পাস করিয়ে নিয়ে এস। না হ'লে লোকেরা যে হাসাহাসি করবে।" যুক্তিটা অচলা দেবীর মাথায় ঢুকলো, তিনি শান্তিলতাকে ফিরিয়ে আনার আর জিদ্ করলেন না। বললেন—"দেখ, মণ্ডলদের বাড়ীতে এক দারোয়ান পাঠিয়ে এক চিঠি লিখে জানিয়ে দাও যেন শশাঙ্ক মণ্ডল তার ছেলে বীরেনকে শান্তিলতার সংগে মেলামেশা

করতে নিষেধ করে।" রামতনুবাবু গিন্নির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—"যদি শশাঙ্কবাবু আমার কথা না শোনেন, বরং পাল্টা জবাব দেন—আপনারা আপনাদের মেয়ে সামলান, তখন কি হবে?" কি হ'বের উত্তর দিতে অচলা দেবীর বেশ একটু দেরী হোলো। একটু চিন্তা করে বললো—"আমাদের মেয়ের কি দোষ, বীরেনই তো ওর সঙ্গে মেলামেশা করে বার কল্লে এই মন্দিরে কথা শুনতে হ'চ্ছে।" রামতনুবাবু উত্তর দেন,—"দেখ গিন্নি তুমি যে যুক্তি দেখাচ্ছ ওরা ঠিক্ সেই যুক্তি দেখাবে। ফল কিছুই হ'বে না। মাঝখান থেকে ঝামেলা বাড়বে। বরং পার যদি শান্তিকে আনিয়ে আসল কি ব্যাপার জানতে চেষ্টা কর। তার পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যাবে। তা ছাড়া মেয়ে কলেজে পড়ে, সে নিয়ে পাড়াগাঁয়ের লোক একটু সমালোচনা করবেই। আজ গাঁয়ের ছেলে বীরেনের নাম জড়িয়ে সে সমালোচনা চলেছে—এর পরে অন্য অচেনা ছেলের নামের সঙ্গে শান্তির কথা উঠ্‌বে; এসব সহ্য করতে হ'বে। যদি মনে করে থাক তোমরা জমিদার, লোকে কোনো সমালোচনা করবে না, তা হলে মারাত্মক ভুল করবে। কারণ দিনকাল বদ্‌লেছে, এখন কেউ কারও তোয়াক্কা রাখে না।" অচলাময়ী চিন্তিত হয়ে উঠলেন। রামতনুবাবু জরুরী কাজের অছিলায় বিদায় নিলেন। কর্ত্তা চলে গেলে অচলা দেবী খেঁদির মাকে দিয়ে নায়েব মশায়কে ডাকিয়ে ভোরের ট্রেনে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন এবং উপদেশ দিলেন কলকাতা যাওয়ার কথা

কর্ত্তা যেন না শোনেন। কারণ তিনি জানতেন কর্ত্তাদের যারা পরিচালিত করেন তাদের অনুগ্রহ পেলে কর্ত্তার প্রসাদ লাভ অত্যন্ত সহজ। নায়েব মশাই প্রস্থানোদ্যোগ করলে অচলা দেবী বললেন—"একটু শুনুন, শান্তিকে গিয়ে বল্‌বেন আমি অত্যন্ত অসুস্থ, সে যেন কালই আপনার সংগে চলে আসে।"

সন্ধ্যার ঠিক আগের মুহূর্ত্ত অর্থাৎ যাকে বলে 'গোধূলি'। অল্প অল্প ঝিম্‌ ঝিম্‌ বৃষ্টি পড়ছে। মণ্ডলদের বৈঠকখানা। অল্প জিনিষপত্র সুন্দর ভাবে সাজানো এই বাইরের ঘরখানা মণ্ডলবাড়ীর একটি সাধারণ রুচির পরিচায়ক। একটি টেবিল, তিনখানা চেয়ার, একটি বড় বেঞ্চ। পূব দিকের দেওয়ালে ঘড়ি—ছোট টেবিলের ওপর দোয়াত কলম—কাগজ আর বাংলা ইংরাজী অভিধান—পরিপাটি করে সাজানো। উত্তর দিকে দেওয়ালের কোণ ঘেঁসে একটি তক্তাপোষ, তার ওপর একটি পরিষ্কার মাদুর পাতা এবং দুটি বালিশ আছে। বালিশ দুটি এলোমেলো অবস্থায় কিছু আগে অন্যের প্রয়োজনে লাগার সাক্ষ্য দেয়। রাস্তাঘাটে লোকজন বড় একটা নাই। গজেন্দ্র হিমেল হাওয়া থেকে শরীরটা রক্ষার জন্য পরনের কোঁচার অংশটা গায়ে জড়িয়ে বসে আছে। গজেন্দ্র একটু ভাবুক প্রকৃতির লোক। বর্ষার বারিধারার সংগে সংগে তার কি ভাব মনে দোলা দিয়ে উঠছিল তা বলা যায় না। তবে তার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছিল—গোধূলি বেলায় বৃষ্টিটা সে সত্যই উপভোগ করছিল।

স্মৃতি

বীরেন্দ্রনাথ আজ ঠাণ্ডা হাওয়া থাকায় একটু বেশী ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভেজা কাকের দল বাইরে হঠাৎ এমন গোলমাল সুরু করলো যে বীরেনের ঘুম না ভেঙে পারলো না। বীরেন তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বস্‌লো—প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে দেখে নিজের কাছেই কেমন যেন লজ্জিত হোলো। বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে রান্নাঘরের দিকে উঁকি দিয়ে চায়ের চাহিদা জানিয়ে দিল। বৌদি যোগমায়া আর বিরাজ তখন গল্পে মশগুল। বিরাজ তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বিস্ময়ের সুরে বললো—"দাদা, তোমার ঘুম ভাঙ্‌লো?" চোখ রগড়াতে রগড়াতে বীরেন বললো—"কেন তোরা কি ভেবেছিস্, এ ঘুম আর ভাঙ্‌বে না?" বিরাজ রাগত স্বরে বল্‌লো—"যাও দাদা, তুমি যে কি বল?" যোগমায়া বিরাজের ওকালতি করতে ছুটে এলো—বললে "গাঢ় ঘুমের মাঝখানে যখন চেনা আর আধো-চেনাদের কথা মনে পড়ে তখন কি মনে হয় নিশ্চয়ই জান ঠাকুরপো?" বিস্মিত বীরেন বল্লে—"কি?" "তখন মনে হয় এ ঘুম যেন আর না ভাঙে, ঠাকুরঝি তোমাকে সেই ইঙ্গিতটাই দিচ্ছিল—ও বোঝাতে পারে নি আর তুমিও না বুঝবার প্রতিজ্ঞা করেছ।" অর্থাৎ তুমি বলতে চাও—আমি স্বপ্ন দেখেছি এবং ঘুমের মাঝখানে কল্পনায় তোমাদের সবাইকে বলেছি—

"স্বপ্ন যদি মধুর এমন হোক্ সে মিছে কল্পনা
আমায় জাগায়ো না জাগায়ো না!"

যোগমায়া হো হো করে হেসে বললো—"ঠাকুরপো নতুন

স্বপ্ন দেখতে শিখেছ কি না—তাই আমার কাছে ধরা পড়ে গেলে। বীরেন বুঝতে পারলো না সে কিসে কি ভাবে ধরা পড়লো। বৌদির রসিকতা এড়ানোর জন্যে বললো—"ঢের হয়েছে! দয়া করে একটু চা খাইয়ে আমাকে তৃপ্ত কর দেখি, ওসব স্বপ্ন আর কল্পনার ভেতর আমি নাই।" কালবিলম্ব না করে বীরেন বৈঠকখানার দিকে চলে গেল। যোগমায়া হাস্‌তে হাস্‌তে বিরাজের হাত ধরে রান্না ঘরে ঢুকলো।

বীরেন বৈঠকখানায় ঢুকেই গজেন্দ্রকে সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে একটু চমকে উঠলো। "বীরেন ফিরে যাচ্ছিস?" গজেন্দ্রই তাকে ডেকে বললে—"আয় বস।" বীরেন চেয়ারে বসলো,—গজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলো —"আজ বুধবার না বীরেন?" "হ্যাঁ, দাদা।" ছোট উত্তর আসে বীরেনের কাছ থেকে। "তা হলে তুই আগামী রবিবার কলকাতায় ফিরে যাচ্ছিস?" প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশা করে গজেন্দ্র।

বীরেন্দ্র একটু চিন্তা করে জবাব দেয়—"আমি ভাবছি শুক্রবারেই চলে যাব।"

"কেন তোর তো এখনো অনেক ছুটী বাকী। তবে এত ব্যস্ত কেন?"

"না এমনি, হাসপাতালে attend করতে হবে।" বীরেন অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়। সত্যি কথা বলতে কি হাসপাতালের হতভাগ্য মুমূর্ষু রোগীদের জন্যে বীরেনের কোন ব্যস্ততা ছিল না, যত তার তাগিদ্ শান্তিলতার জন্যে।

দু'ভায়ের মধ্যে যেন কথাবার্ত্তা আর এগুতে চায় না। বীরেন কি বলবে ঠিক করতে না পেরে হ্যারিকেনের বাতি তুলে দিয়ে টেবিলের ওপরের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সুরু করলো। গজেন্দ্র বললে—"হঠাৎ বৃষ্টি এসে পূজার বাজারটা মাটি করে দিলে। তুই এখন বেরুবি না কি—বাড়ুয্যে বাড়ীতে যাবি না কি?" বাড়ুয্যে বাড়ীর কথা উঠতেই হঠাৎ সেদিন অচলা দেবীর ব্যবহারের কথা বীরেনের মনে পড়লো—বললো —"না এই বর্ষায় আর ওদিকে যাব না : একবার লাইব্রেরীতে যেতে চেষ্টা করবো।"

এমন সময় দু'টি কাপ নিয়ে বিরাজ বৈঠকখানায় প্রবেশ করে। বীরেনের সামনে চায়ের কাপ দিয়ে গজেন্দ্রর দিকে এগিয়ে গেলে গজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করে—"বিরাজ আমারও জন্যে কি চা এনেছিস্ না কি?" দাদার সামনে কাপটি নামিয়ে রাখতে রাখতে বিরাজ উত্তর দেয়—"না দাদা, তুমি তো চা পছন্দ কর না, তাই তোমার জন্যে দুধ এনেছি।" দাদারা আর তাকে উদ্দেশ্য করে কোন কিছু না বলায় বিরাজ ধীরে ধীরে চলে গেল।

বীরেন গজেন্দ্রকে বলে—"এ বছর দেশের চাষীদের অবস্থা কেমন দাদা?" গজেন্দ্র বলে—"একদম ভাল নয়। সরকার কতগুলো অপদার্থ কর্ম্মচারী দিয়ে কৃষিবিভাগকে ভরিয়েছে—সাধারণের অর্থ জলের মত অপচয় হচ্ছে—না আছে যথাসময়ে সার-বীজ সরাবরাহের ব্যবস্থা। সরকারী কর্ম্মচারীরা দিনরাত

বসে বসে তাস খেলে আড্ডা মেরে কাটাচ্ছে, চাষীদের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নাই। অনেক জায়গায় লোকেরা জানেই না যে কর্ম্মচারী জনসাধারণের অর্থে পোষা হচ্ছে কৃষির উন্নতির জন্যে।"

বীরেন উত্তেজিত হ'য়ে বলে,—"এই সব অপদার্থগুলোকে বিদায় করে দিলে তো কাজ হয়।"

গজেন্দ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে—"কিন্তু ভাই, করে কে? জাতীয় সরকার বলে আমরা যতই চেঁচাই না কেন জাতের আসল মানুষগুলোর দিকে লক্ষ্য না ক'রে সচিব আর পরিষদ-সচিববর্গ তাঁদের কর্ম্মচারীদের তোয়াজে ব্যস্ত। এতক্ষণ ধরে হারু, নকুল, বৃন্দে মোড়ল আর ভোক্তের সঙ্গে আলোচনা করছিলুম। সরল কৃষক তারা। প্রাণপণে খেটে ফসল ফলায়। কিন্তু গরীব মানুষ মাল মজুত করতে পারে না। সস্তা দামে ফোরেদের বিক্রী করতে বাধ্য হয়।"

বীরেন বলে "ওরা তো পাট, তুলো বা ধান সোজাসুজি মিলমালিক বা মহাজনদের কাছে বিক্রী করতে পারে। দালালদের কাছে বিক্রী করলে তো আর ঠিক দাম পাওয়া যায় না।"

"কিন্তু ভাই, কোন্ পথে কি ক'রে মাল কোথায় ওরা নিয়ে যাবে? লেখাপড়া ওরা শেখেনি, শেখার সুযোগ পায় নি, তাই ওদের দৃষ্টির বাইরেও যে আরও বিস্তৃত দুনিয়া আছে সে সংবাদ ওরা রাখে না।শুধু দুঃখের দিনে বরাতের ওপর নির্ভর

করে। ভগবানকেও দোষী করার সাহস ওদের নাই।" গজেন্দ্র ভুলেই গিছলো যে সে বীরেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছে। বক্তৃতার ঢং-এ এতগুলো কথা এক সঙ্গে বলে একটু জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো।

বীরেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলো—বললো—"মানুষকে বঞ্চিত করে আজ যারা বড় হয়েছে তাদের বড়ত্ব ঘুচবেই। পাকিস্থান সৃষ্টি তো মুসলমান ক'রে নি—ইংরেজ করে নি—করেছে তথাকথিত বনেদী বর্ণ-হিন্দুরা। যুগযুগান্তের অবহেলায় অনাদরে মানুষের অন্তর দেবতা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবেই, এবং যেদিন তা সম্ভব হ'বে সেদিন হবে সত্যিকারের স্বাধীনতার সূচনা। যে স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে ব্যবধান অপসারিত করতে অক্ষম, তাকে যত মূল্য দিয়েই কেনা হোক্ না কেন তা আমার কাছে মূল্যহীন ও অচল।"

বীরেনকে সমর্থন করে গজেন্দ্র বলে—"তোমার সঙ্গে এবিষয়ে আমি একমত বীরেন। দেশ দেশ করে আমরা যতই চেঁচামেচি করি না কেন যতদিন না আমরা দেশের সমাজনীতির কাঠামো বদ্‌লাতে পারবো ততদিন আমরা শান্তি পাব না। গণ-দেবতা স্বীকৃতি পাবে না। আজ চতুর্দ্দিকে জোড়াতালি দেওয়ার ব্যবস্থা। মনের মিল হোক না হোক্—প্রাণে প্রাণে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের পাহাড় গড়ে উঠুক—সেদিকে আমাদের খেয়াল নাই, হাতে হাত মিলিয়েই আমরা মহামিলনের অভিনয় করে চলেছি। এই তো আমাদের চোখের সামনে একই কালে

কত মহান ব্যাক্তিকে কত মহান আদর্শকে পেয়েছি। কিন্তু দেশের ক'জন আমরা তাঁদের অনুসরণ করে সমাজ-গঠনের চেষ্টা করছি?" বীরেন্দ্র নীরবে এতক্ষণ দাদার কথা শুনছিল, গজেন্দ্রের প্রকাশ ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে তার দেহে শিহরণ জাগছিল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বীরেন্দ্র বললো—"সত্যি দাদা, আমাদের জীবন আজ কেবল কথার ফানুসে পরিণত হ'য়েছে—কাজের মানুষ মেলা ভার। যত দিন এই হতভাগা দেশ থেকে অশিক্ষা দূর করা সম্ভব না হ'বে ততদিন দেশের দুর্দিন ঘুচবে না। আমি কোনো আদর্শের কথা বলছি না। সাধারণ মানুষ তার বাঁচার জন্মগত অধিকারের কথা চিন্তা করুক—তার সে অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করুক—এই তো চাই। দাদা, তোমার সঙ্গে আমার একটা বিষয়ে কতটুকু মিল হবে জানি না। সমাজ জীবনে আমরা যে জাতের প্রশ্ন তুলে বিষয়কে গভীর আর জটিল করি আমার ধারণায় সত্যি সেটা খুব জটিল নয়। আমার মনে হয়—শুধু আমাদের দেশে নয় সারা বিশ্বে দু'টি মাত্র জাত বা সম্প্রদায় আছে, এক হ'চ্ছে ধনী—অপর হ'চ্ছে দরিদ্র—এক হ'চ্ছে অত্যাচারী অপর হ'চ্ছে অত্যাচারিত—এক হ'চ্ছে শাসক অন্য হ'চ্ছে শাসিত।"

"ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য।"—গজেন্দ্র বীরেনকে সমর্থন করে।

বিরাজ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকে—"ছোট্‌দা, কে তোমাকে ডাকছেন দেখ।"

বীরেন তৎক্ষণাৎ বাইরে যায়। গজেন্দ্রও উঠে গায়ের কাপড়টি ভাল ভাবে জড়িয়ে নিয়ে হ্যারিকেনের বাতিটা আরও একটু তুলে দিয়ে হ্যারিকেন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শুক্রবার। গত রাত্রির শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে—সব থেমে যাওয়া বৃষ্টির ছাপ গাছের পাতায় চালের ছাউনিতে তখনও বিদ্যমান। বীরেনের মন এবারে কেন যেন দেশ ছেড়ে কলকাতায় যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হোলো। সে দু'দিন আগেই বলেছে—কলেজের পড়ার তাগিদ্ আছে অতএব শুক্রবারেই চলে যাবে। কিন্তু বৃষ্টির বহর দেখে তাকে সে ইচ্ছা ত্যাগ করতে হ'য়েছিল, অবশ্য এর জন্য যোগমায়াকে একরকম ওকালতি করতে হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যখন বীরেন জানিয়ে দিল সে কালই কলকাতা ফিরে যাবে—মা বল্লেন—"দুদিন পরে যাস্।" "না মা, যেতেই হবে।" বলে বীরেন তার যাওয়ার তাগিদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। মা ঘর থেকে অন্য কাজে বাইরে গেলে, বৌদি বিদ্রূপের স্বরে বললো—"বলি কোন্ রোগিনী না নার্সের কথা মনে পড়ে তোমাকে ঘর ছাড়া করছে ঠাকুরপো? এ হেন বর্ষায় কি একলা মন টেঁকে?—'দখিনে বাতাসে কেহ নাই পাশে সাথের সাথী'—কি বল?" যোগমায়া আপন মনে হেসে ওঠে। বীরেন বৌদির কথা শুনে মুগ্ধ হয়। বলে "তা বৌদি, তুমি তো যে সে বৌদি নও। কাব্যরসের প্রস্রবন তোমার প্রাণের ভিতরে উদ্যাম গতিতে বয়ে চলেছে দেখ্ছি।" যোগমায়া উত্তর দেয়—"নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখ, সেখানে কাব্য মহাসাগর

আবিষ্কৃত হ'বে।" বীরেন বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করে—"অর্থাৎ?" "অর্থাৎ—মানে—যারা জীবনে একান্ত হয়ে আসবে তাদের কথা চিন্তা করে। মায়ের আদেশ আমাদের অনুরোধ আব্দার উপেক্ষা ক'রে যে জন ছুটে যায় সেখানে কি তার কল্পনা-পাহাড়ের ঝরণায় স্বপ্ন-সাগর রচিত হয় নি?" "বৌদি এবার হার মানলুম—দু'দিন পরেই কলকাতা যাব। বা—বা! তুমি উকিল হ'লে না কেন বৌদি?" যোগমায়া হেসে বলে—"উকিল হলে তোমার এই দজ্জাল বৌদির আসন পুরোণ করতো কে?" এমন সময় মা ঘরে ঢোকেন. বীরেন বলে—"তোমরা যখন সবাই—বলছো—তখন না হয় রবিবারেই কলকাতা যা'ব।" মা খুসী হন, যোগমায়া পাশে দাঁড়িয়ে হাসে। এই গেল বৃহস্পতিবার রাত্রির ঘটনা। শুক্রবার সকাল না হতেই যোগমায়া এসে বীরেনকে বিরক্ত করে—"কৈ ডাক্তার সাহেব, কলকাতায় হাসপাতালে যে রোগী মারা যায়—যান তাড়াতাড়ি!" বিরাজ সঙ্গে ছিল, বৌদিকে ধাক্কা দিয়ে বলে—"রোগীদের নাম ক'রে ওকি রসিকতা বৌদি? আ-হা! সে বেচারীরা কত কষ্ট পাচ্ছে।" যোগমায়াও বিরাজকে ধাক্কা দিয়ে বলে—"যাও না তুমি নার্স হয়ে তাদের সেবা ক'রে দাও, তাদের ত উপকার হ'বেই, অধিকন্তু কুমারী নার্সদের পরিণতি ভাবী কোন ডাক্তারের সঙ্গে পরিণয়ের মধ্যে ঘটতেও পারে।" বিরাজ আরও জোরে যোগমায়াকে ধাক্কা দিয়ে বলে—"কি যে তুমি রসিকতা কর সব সময়ে?" এতক্ষণে বীরেনের ঘুম ভাঙে। মুখ না ফিরিয়েই বলে—"কি. চা

হোলো?" যোগমায়া তাড়াতাড়ি জবাব দেয়—"ভাত রান্নাও হয়ে গেছে—কলকাতা যাবে যে?" বিরাজ বলে, "না দাদা, মিছিমিছি, কিছু হয় নি। বৌদি নিজেই এই ঘুম থেকে উঠে এল।" "আর তুমি বুঝি সারা রাত জেগেই ছিলে? রাত্রি ৩-টায় শয্যা ত্যাগ করেছ?" "আমার দায় পড়েছে জেগে থাকার?" "আচ্ছা যা ঘুমোগে।" বীরেন মুখ না ফিরিয়েই বিরক্তির সঙ্গে ধমকের সুরে বলে। যোগমায়া ও বিরাজ একসঙ্গে হেসে ওঠে। বীরেন ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে, চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে —"একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দিলে না।" যোগমায়া ছাড়বার পাত্রী নয়, কড়া কটাক্ষে বলে—"কেন, সারা রাত ধরে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালো কে? কলকাতায় যেতে পারলে না বলে কি স্বপ্ন-পথে হাসপাতাল থেকে, না যাদের কাছে প্রয়োজন ছিল তাদের কাছ থেকে ঘুরে এলে?" বিরাজ ইঙ্গিত বুঝলো। আর অপেক্ষা না ক'রে হেসে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বীরেন বৌদির কথায় বিরক্ত হয় নি। আনন্দের সঙ্গে উপভোগ ক'রলো এবং কথা বলার ভঙ্গী ও উপস্থিত বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হ'ল— মুগ্ধ হ'ল।

মায়ের অসুখ, সুতরাং আবহাওয়া খারাপ থাকলেও শান্তিলতা গ্রামে আসার জন্যে বদ্ধপরিকর হোলো। তার মামীমা নিষেধ করলেন। নায়েব মশায়েরও ইচ্ছা নয় যে সেই ঝড়বাদলে তিনি কলকাতা থেকে যাত্রা করেন; কিন্তু শান্তি-লতাকে অচলাময়ীর উপদেশ অনুসারে তাঁর অসুখের সংবাদ

দেওয়া হয়েছিল। এখন তো বলে ফেলা কথা ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। অগত্যা নায়েব মশায়কেও রওনা হ'তে হোলো।

অচলাময়ী জানতেন তার কন্যা শান্তিলতা যতই লেখাপড়া শিখুক আর যাই করুক না কেন তার অসুখের সংবাদে স্থির থাকতে পারবে না। সেইজন্য তিনি ট্রেনের সময়ে হাজির থাকার জন্য দু'জন চাকরকে ডেকে হুকুম করলেন।

শারদীয়া বর্ষা, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ভাল লাগে না। বীরেন চা খাওয়ার পরেই ঘোষণা করলো—"আজ চমৎকার খিঁচুড়ী খাওয়ার দিন, অতএব খিঁচুড়ী চাই।" যোগমায়া খুসী হ'য়ে বললো—"তোমার Suggestion সত্যি সুন্দর, কিন্তু খিঁচুড়ীকে সত্যই উপভোগ করার জন্যে আমি আর একটু Suggest করি—পাঁপড় ভাজা চাই।" "তাতে কি হ'য়েছে বৌদি, ওতো নিশ্চয়ই চাই, আমি বলি কি ডিম্ ভাজাও কর।" বিরাজ এসে বলে "দেখ দাদা, আলুবখ্রার চাট্নি কিন্তু শেষের দিকে না হ'লে ভাল হ'বে না।"

তিনজনে বসে বাজারের ফর্দ্দ বানানো হোলো। বীরেন বললে--"অন্য কাউকে পাঠানোর দরকার নাই, আমি নিজেই বাজারে যাব।"

বাজারের থলিয়া হাতে মাঠের ধারেই সেই আধভাঙা পথ বেয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে বীরেন বাজার করতে চলেছে। বাজার ওদের বাড়ী থেকে একটু দূরে, জমিদার বাড়ীর কাছাকাছি। বীরেন অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবতে ভাবতে চলেছে। রবিবার

গিয়েই শান্তিলতার সঙ্গে আগে দেখা করবে। তার মা চান না যে শান্তিলতার সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠতা রাখুক। কোথায় অপরাধ—কেন সন্দেহ—বীরেন কোনো প্রকৃত কারণ খুঁজে পেল না। সে চিন্তা করতে চেষ্টা করলো—কোথায় অশোভন ঠেকলো যার জন্যে সেদিন শান্তিলতার মা অর্থাৎ অচলা দেবী পূজার মণ্ডপে তাকে সাবধান ক'রে দেওয়ার সুযোগ নিলেন। এই ভাবে চিন্তা করতে করতে বীরেন কাদা পথ দিয়ে চলেছে; হাঁটুর ওপর কাপড় গুটিয়ে পরা। মাঝে মাঝে পা পিছলে বীরেন পড় পড় হচ্ছে, পাশের গাছপালা ধরে সামলে নিচ্ছে। সেই রাস্তার মোড়টায় অর্থাৎ যেখানে এই রাস্তা আর জমিদার বাড়ুয্যেবাড়ীর দিক থেকে আসা রাস্তাটা সাঁতরা পাড়ার কাছাকাছি মিলেছে সেইখানে বীরেনের সঙ্গে জমিদারবাবুর চাকর শ্রীমন্ত আর ভোলার দেখা। দুজনেই বীরেনকে চিনতো এবং ভাল মানুষ উচ্চ শিক্ষিত বলে শ্রদ্ধা ও খাতির করতো। ভোলা জমিদারবাড়ীতে নবাগত হ'লেও শ্রীমন্তের দেখাদেখি খাতির করার লোককে খাতির করতে শিখেছে। বীরেনকে দেখেই শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করে—"এই বরষাবাদলায় কোথায় চললেন বাবু?" খুসী ও ব্যস্ত হ'য়ে বীরেন বলে—"কে, আরে শ্রীমন্ত-ভোলা যে, কোথায় চলেছ?" ভোলা চুপ করে থাকে, শ্রীমন্ত উত্তর দেয়—"দিদিমণি কলকাতা থেকে আসবেন কি না তাই ইষ্টিশনে যাচ্ছি।" "দিদিমণি!" বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করে বীরেন। কারণ, বাড়ুয্যেবাড়ীতে একটি মাত্রই

দিদিমণি আছে—শান্তিলতা. তবুও অন্য কেউ হ'তে পারে মনে করে জিজ্ঞাসা করলো—"কোন্ দিদিমণি?" এবার ভোলা তড়িৎবেগে জবাব দেয়—"কেন. আমাদের দিদিমণি—যিনি কলেজে পড়েন?" "না, তিনি তো এ ছুটীতে বাড়ী আসবেন না।" বীরেন বিস্মিত ভাবে বলে। শ্রীমন্ত জবাব দেয়—"তাই তো শুনেছিলুম বাবু, কিন্তু কি যে হোলো—নায়েব মশায় কাল ভোরেই কলকাতা রওনা হয়েছেন—তাঁকে আনবার জন্যে।" আরও বিস্মিত ভাবে বীরেন প্রশ্ন ক'রে—"বাড়ীর সবাই ভাল আছেন তো, বড়বাবু, মাসীমা—সবাই সুস্থ তো?" একটু দুঃখের স্বরে শ্রীমন্ত জবাব দেয় "হ্যাঁ বাবু. সবাই তো ভাল, কারও তো কিছু হয় নি।" "তবে?" বীরেন চিন্তিত হয়ে ওঠে। এক মিনিট ভেবে নিয়ে বলে, "আচ্ছা তোমরা যাও. ট্রেন এসে যাবে।" বীরেনের পাশ দিয়ে তারা চলে গেল. বীরেনও একটু জোরে পা চালিয়ে দেয়,—তখনও ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ে ছাতার ওপরে। বীরেন ভাবে বাজারের কাছেই ত জমিদারের বাড়ী, কাউকে একবার জিজ্ঞাসা করবে কি—শান্তি-লতাকে অকস্মাৎ কলকাতা থেকে লোক পাঠিয়ে আনার কি এমন কারণ ঘট্‌লো? কিন্তু সংগে সংগে তার মাত্র দু'দিন আগেকার ঘটনা মনে পড়লো। সামান্য খামকে কেন্দ্র করে অচলা দেবী যে কাণ্ডটা করলেন তারপরে আর শান্তির প্রসঙ্গ তোলা কোনো দিক থেকে শোভন হ'বে না। সেইজন্যে ঠিক করলো—বাজারগুলো বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে সে একবার

ষ্টেশনের দিকে যাবে, কিন্তু ফিরে আসার পথে ভাবলো—না তাও যাওয়া উচিত নয়। পুরুষের মন নারীমানসকে পরীক্ষা করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হোলো। বীরেন ঠিক করলো—সে তো যাবেই না, অধিকন্তু সে দেখ্‌বে শান্তিলতা তার খোঁজ করে কি না। কারণ সে তো জানে বীরেন এখন গ্রামেই আছে। বীরেন বাজার সেরে ফিরলো, সে ফর্দ্দ-মাফিক সব জিনিষই এনেছিল, কিন্তু শান্তিলতার আকস্মিক আসার সংগত কারণ কি ঠিক করতে না পারায় মনটা উদ্বিগ্ন ছিল। তাই জিনিষপত্রগুলো ঠিক মত দেখে আনতে পারে নি। যোগমায়া বাজার দেখে তো হেসে খুন—"না ঠাকুরপো, তোমার দ্বারা কিছু হ'বে না। এই যে কাটা পাঁপর নিয়ে এলে—তার আকার গন্ধ কি খেতে ভাল লাগবে?" জিনিষগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে যোগমায়া মন্তব্য করে। অন্য সময় হলে বীরেন এই ধরণের রসাল মন্তব্য বিশেষ ভাবে উপভোগ করতো। কিন্তু এখন তার মনের আনাচে-কানাচে শান্তিলতা ঘুরে ফিরছে, সুতরাং অন্য কিছু তার ভাল না লাগাই স্বাভাবিক। বিরাজ বাজার করায় বীরেনের অজ্ঞতার উল্লেখ করতে গিয়ে এক কড়া ধমক খেয়ে একদম চুপ হ'য়ে গেল। যোগমায়া বীরেনের পরিবর্ত্তিত মনো-ভাব লক্ষ্য করে আর রসিকতা করার সাহস করলো না। ভাবলো —সব সময়ে তো মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে না। বেচারী ভিজে ভিজে বাজারে গেছে, কাদা জলে কষ্ট হ'য়েছে—অতএব বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক : সুতরাং সে আর কিছু না বলে জিনিষপত্র

গুছিয়ে রাখলো। বীরেন বাহিরের ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসে একটা বাংলা উপন্যাস খুলে পড়তে চেষ্টা করলো ; কিন্তু পড়া আর এগুতে চায় না। এক ঘন্টায় মাত্র দু'পাতা পড়েছে। শান্তিলতার সঙ্গে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা নিকট পরিচয়ের স্মৃতি আজ এতদিন পরে বীরেনকে ব্যথিত করলো। হারানো দিনের ঘটনা একে একে তার মনে জাগলো। একটি দিনের ঘটনা—ভয় সংশয় আনন্দ মেশানো সেদিনের স্মৃতি সত্যই চির নতুন —চির লোভনীয়। বীরেন তখন মেডিক্যাল কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। গরমের ছুটীতে বাড়ী এসেছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে শান্তিলতাকে একটু অঙ্ক করিয়ে দেওয়ার অনুরোধ শান্তিলতার কাছ থেকেই এল ; বীরেন প্রথমে প্রত্যাখ্যান করে ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শান্তিলতার দাবীর কাছে তাকে নতি স্বীকার করতে হয়। শীর্ণ খালের ধারে দিনের পর দিন শান্তিলতাকে গণিতের চোরাগলি ঘুজে ঘুরিয়ে আনার মধ্যে বীরেন্দ্র আনন্দ পেল। কিন্তু মনের কোথায় যেন কি প্রশ্ন জেগে উঠতো। শান্তির মনেও যেন অজানা কি এক অশান্তি। বীরেন উদ্যোগী হয়ে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করলো। শান্তির অঙ্ক শেখার আর বীরেনের অঙ্ক শেখানোর সময় ছিল বৈকালে—নির্জ্জনে খালের ধারে। বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে শান্তি চিরাচরিত প্রথায় বেড়াতে আসতো, তাকে বুঝিয়ে দিল বীরেনদা খুব ভাল অঙ্ক জানেন, সুতরাং একটু তার কাছে অঙ্ক শিখে নেব। বুড়ো দারোয়ান শান্তিকে শিশুকাল

থেকে দেখেছে, তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে এবং বীরেন মণ্ডলের মত ভাল ছেলের প্রতিও তার শ্রদ্ধা আছে, সেইজন্য এতে সে কোন দিন নিজে কিছু মনে করে নি বা বাড়ীতে কাউকে একথা বলার দরকার আছে বলে বিবেচনা করে নি।

একটি বিশেষ দিন। সেদিন বীরেন একটু সকাল সকাল বেড়াতে বেরিয়ে যথাস্থানে শান্তির জন্য অপেক্ষা করছিল। শান্তিও কি ভেবে কেন যে আগে আগে বেরিয়েছিল তা সে নিজেই ভাল করে বোঝে নি। দারোয়ান রামহরি ক'দিন থেকে ঠিক করেছিল পাশের গাঁয়ের জমিদার নীলরতন শাসমলের বাড়ীর দারোয়ান তার ছোট ভাই ভজহরির সঙ্গে একটু ফুরসুৎ করে দেখা করবে। কিন্তু কাজের তাগিদে তা আর হ'য়ে ওঠে না। ঐ দিন অনেকখানি বেলা আছে দেখে সে শান্তিলতাকে বললো—"দিদিমণি, তুমি বীরেন্দর বাবুর কাছে আঁক কষ, আমি ভজহরির সঙ্গে দেখা করে তাড়াতাড়ি আস্‌বো। শান্তি-লতা ভজহরিকে চিন্‌তো, তাই কোন আপত্তি করল না। তা ছাড়া সেও যেন এমনই একটা নিরালা সুযোগের অপেক্ষা করছিল কিছু দিন থেকে। দারোয়ান কাছে থাকে, বীরেন একটু অঙ্ক করিয়ে দেয়, পথচলা দু'একজনের লক্ষ্যে পড়লেও এ নিয়ে কেউ কোন দিন মাথা ঘামায় নি। আজ একান্ত দু'জনে ভাবতে শান্তির আনন্দ জাগলো, কিন্তু ভয়ও হোলো।

"এ কি, মাষ্টার মশায় যে আজ এত তাড়াতাড়ি এসে

গেছেন? আমি ভেবেছিলুম আমিই বোধ হয় বেলা ঠিক করতে না পেরে সকাল সকাল এসে গেছি।"

"দু-জনেরই ভাবনার স্রোত যেন এক সঙ্গে বইছে। আমিও তো তাই ভেবে এসেছি।" হাসি মুখে বীরেন শান্তির দিকে তাকায়। শান্তিলতার ঠোঁট ও চোখের কোণে তখন হাসি ফুটে ওঠে। বীরেন এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে—"শান্তি, আজ তোমায় একটা বিশেষ কথা বলার আছে. তাই—"

"এমন কি কথা মাষ্টার মশায়, যার জন্যে রোদ চলে পড়ার আগেই আপনি ঘর থেকে চলে এলেন?" শান্তিলতার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি। একটু থেমে শান্তি আবার বলে—"অংক শেখাতে শেখাতে তো রোজই কত কথা বলেন।"

একটু দুঃখিত ভাবে বীরেন বলে—"ঠাট্টা করছো শান্তি, কিন্তু বিশ্বাস কর তোমাকে একটা কথা বলার জন্য ক'দিন ভেবেছি. কিন্তু সময় ও সাহস হয় নি।"

শান্তি আবার হেসে ঠাট্টা করেই বলে "তা হলে খুব দামী কথা নিশ্চয়ই। পরীক্ষায় খু—ব উপকারে লাগবে। খাতা পেন্সিল বার করবো না কি?" আসলে শান্তি সেদিন কোনো খাতা বা পেন্সিল নিয়ে যায় নি।

বীরেন গম্ভীর ভাবে বলে—"লেখার কোন প্রয়োজন হবে না শান্তি, শুনলেই চলবে।"

আরও রসিকতা করে শান্তি বলে—"কিন্তু এত মূল্যবান কথা শুনে মুখস্থ হ'বে কেমন ক'রে?"

স্মৃতি

"বই-এর মুখস্থ পড়া নয় শান্তি। এ নিছক তোমার আমার নিজস্ব কথা।" বীরেনের স্বর একটু কম্পিত। শান্তির শিরায় শিরায় তখন রক্তের আলোড়ন। কারণ তারও যে কথা মনের ভেতরে কয়েকদিন যাবৎ আছাড় খেয়ে ফিরেছে, প্রকাশের পথ খুঁজে পায় নি, আজ যেন তার মুক্তিলগ্ন সমাগত।

বীরেনকে নিছক পরীক্ষা করার জন্য শান্তি খালের ধারে সেই সব চেয়ে নিচু জায়গাটীর দিকে নেমে গেল। জলের ধারে ঘেঁসে বসে একটা কাঠি নিয়ে জল নাড়তে লাগ্‌লো। বীরেন যেন একটু ভয় পেয়ে গেল। ওতরফের উৎসাহের অভাব দেখে অন্য কথা বলার চেষ্টা করলো। শান্তির কাছে এগিয়ে গিয়ে বীরেন বললো—"বই খাতা এনেছ শান্তি?" ছোট্ট একটি "না" বলে ধীরে ধীরে শান্তি আরও নীচে নেমে গেল এবং বাঁ পাশের একটা উঁচু ঢিপিতে বসে পড়লো। বীরেনও তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, এবং জিজ্ঞাসা করলো—"আচ্ছা শান্তি, আমি কি তোমাকে ঠিকমত পড়াই না?"

"কেন, কোনো দিন কি আমি তাই বলেছি না কি? আর তা যদি ভাববো তা হ'লে এমন করে চুরি করে আপনার কাছে পড়তে আসবো কেন?"

বীরেন খুসী হ'য়ে বলে—"যাক্, আর পড়ার কথা বললো না, কিন্তু আজ বই নিয়ে এলে না কেন?"

"বারে, এই তো বললেন—আজ পড়াবেন না, কি বলবেন।"

"ওঃ, কিন্তু তুমি সে তো আগে জানতে না। তা ছাড়া এ তো তোমার পুরাতন পড়া নয় যে একবার বললেই মনে থাকবে।"

শান্তি এবার দুষ্টুমি করে বলে—"এ অতি পুরাতন পাঠ, একদম মুখস্থ—এতে বই লাগে না।"

"শুধু কাছাকাছি, পাশাপাশি থাক্‌লেই চলে, না শান্তি?"

শান্তির বুক কেঁপে উঠেছিল সেদিন—কিন্তু আশ্চর্য্য সব ভয় সংশয়ের মধ্যে দু'জনেই একই অর্থব্যঞ্জক হাসি একই সঙ্গে হেসে উঠলো। সেই হাসিই ছিল সেদিন সাহস—বীরেন নির্ভয়ে উৎসাহে বলতে লাগলো—"আচ্ছা শান্তি, আমাদের ভাবভঙ্গীতে যে কথা প্রায়ই প্রকাশ পায় সেটা মুখে প্রকাশ করতে এত বাঁধে কেন বল তো?"

দু'টি হাঁটুর ফাঁকে কপাল রেখে শান্তিলতা বলে—"লজ্জা।"

"অন্যের সম্বন্ধে আমরা তো প্রকাশ্যে অনেক কিছুই আলোচনা করে থাকি, নিজের বেলা বাঁধে কেন?"

"জানি না।" বলে শান্তি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বীরেন ভাবলো হয়ত শান্তি রাগ করেছে। তাই পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে শান্তির কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো, কৈ শান্তি তো সরে গেল না! বীরেনের রক্তে দোলা লাগলো, হয়ত শান্তিরও তাই। বীরেন একটু চিন্তা করে ডাকে—"শান্তি।"

শান্তি কাঁপা স্বরে উত্তর দেয় "বলুন!"

"বল শান্তি, তুমি আমাকে ভালবাস কি না?"

শান্তি দুষ্টুমি করে বলে—"বারে ভালবাসি না তো অঙ্ক করতে আসি কেন? মাষ্টার মশায়কে কে আবার ভালবাসে না?"

বীরেন একটু ঢোক গিলে বলে—"না আমি ঠিক মাষ্টার মশায়কে ভালবাসার কথা বলছি না।" বীরেন চিন্তা ক'রে —তারপর কি কথা বলা যেতে পারে।

শান্তি সত্যি চালাক—সে তৎক্ষণাৎ বলে—"তবে?" বীরেন মুস্কিলে পড়ে। সত্যকে চাপতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে—"এই বল্‌ছিলাম কি মানে—তোমার ভালবাসা—এই মানে।" ওঃ! বীরেনের সেদিন কি অবস্থা। মুখে চোখে ঘাম—সারা দেহে শিহরণ।

"এ ভালবাসার মানে—প্রিয়তমের প্রতি প্রিয়ার ভালবাসা না?" শান্তি হো হো করে হেসে ওঠে। বীরেন চকিত হয়ে বলে—"ঠিক তাই।" শান্তি আর কোন কথা বলে না। বীরেন একটু থেমে আবার বলে চলে—"কিন্তু শান্তি, আমার ভয় হয় তোমাকে নিজের করে নিতে পারবো কি না।"

"কেন?" বিস্মিত শান্তিলতার ছোট্ট প্রশ্ন; কিন্তু উত্তর দিতে বীরেনকে বেশ বিব্রত দেখা যায়। সে বলে—"তুমি তো জান শান্তি, আমাদের যতই মনের মিল থাকুক না কেন বাইরের অমিল ও ব্যবধানটা বিরাট।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বীরেন।

"এ ব্যবধানকে কি দূর করা সম্ভব নয়? অন্তরের গভীর

ভালবাসা যেখানে দু'টি জীবনের মিলন-সেতু রচনায় সাহায্য করবে সেখানেও কি এ ফাঁককে তুচ্ছ করা চল্‌বে না?"

শান্তি বীরেনের মুখের দিকে তাকায়।

"ব্যপারটা তো নিছক তোমার আমার নয়। এর সংগে দু'টি পরিবার এবং তাঁদের পরিচিত সবাই জড়িত।"

"তাঁদের সবার পরিচয়টাই বড় হোলো—আর আমাদের অন্তরের সত্যিকারের পরিচয়টা তুচ্ছ হোলো? ওসব চলবে না। আমাদের এ ভালবাসাকে অস্বীকার করলে দেবতা অসন্তুষ্ট হ'বেন।"

শান্তির মনের জোর দেখে বীরেন সেদিন খুসী হয়েছিল; শান্তিকে আরও ভাল ক'রে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললো—"আচ্ছা শান্তি, যদি কোন দিন কোনো কারণে আমরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাই, আমাদের এই ভালবাসা কি কোনো মূল্য পাবে না?"

শান্তিলতা এবার রীতিমত হেসে বীরেনকে ঠেলা দিয়ে বলে—"সরে যাওয়ার তো আপাততঃ কোনো সম্ভাবনাই দেখ্‌ছি না।"

বীরেন এবার ইচ্ছা করে শান্তিলতার আরও কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়, শান্তিলতা বীরেনের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বাড়ী যাওয়ার জন্যে রওনা হয়। বীরেনও অন্য দিকে চলে, তখন সূর্য্য অস্তে যায় যায়।

সেদিনের সেই ঘটনা বহুবারই বীরেনের মনে পড়েছে।

স্মৃতি

আজও অতীত স্মৃতির দুয়ারে দাঁড়িয়ে বীরেন বর্ত্তমানের বিপর্য্যয়ের ছোট্ট সন্ধান করতে চেষ্টা করলো।

শান্তি যথাসময়েই সিক্ত বাসে বাড়ী এল। মাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে আশ্বস্ত হোলো, কিন্তু বৃষ্টিতে আসতে যে অসুবিধা ও কষ্ট হয়েছে তার উল্লেখ করে বিরক্ত হোলো। মাকে উত্তেজিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলো—"কি ব্যাপার! একেবারে লোক পাঠিয়ে আমাকে আনতে হোলো?"

বংশী পাশেই ছিল, বললো—"ব্যাপার তোমার মাথা আর মুণ্ডু—বাড়ীতে ঢুকেই চেঁচাতে সুরু ক'রেছে, ভিজে কাপড় ছেড়ে আয় মুখপুড়ি—অসুখ করবে যে।" দাদার শেষ কথাতে শান্তিলতার রাগ জল হ'য়ে গেল, ভাবলো, তার শরীর খারাপ করলে দাদাও তাহলে চিন্তিত হ'বে। আর কথাবার্ত্তা না বলে কাপড় ছাড়তে চলে গেল।

মেয়েকে ভাল করে নিরীক্ষণ করেও অচলা দেবী সন্দেহের কিছুই পেলেন না, তখন আশ্বস্ত হলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর ওপরের ঘরে শান্তি শুয়ে একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল—অচলা দেবী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনলেন শান্তি তাদের অনন্ত চাকরকে বলছে—"এই অনন্ত, তুই বীরেনবাবুকে চিনিস্ তো, আর একটু পরে একটু বৃষ্টি থাম্‌লে গিয়ে বলে আসিস্ যে দিদিমণি হঠাৎ কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি যেন আজই একবার আমার সংগে দেখা করেন।"

অচলা দেবীর সন্দেহ গাঢ় হোলো। তিনি অন্য কাজে না গিয়ে সোজা শান্তিলতার ঘরে গেলেন এবং খাটের পাশে চেয়ারে বসে বললেন—"শান্তি, তোমার আর কলেজে পড়া হ'বে না।"

ম্যাগাজিনটা পাশে সরিয়ে রেখে, উঠে বসে শান্তি বলে—"তার মানে?" অচলা দেবী শান্তির দৃঢ়তা দেখে একটু ভয় পেয়ে যান—বলেন—"লোকেরা তোমার কলেজে পড়ার বিষয় নিয়ে নানা কথা বল্‌ছে—তা ছাড়া বীরেনের সঙ্গে তোমার এই মেলামেশাটা লোকে ঠিক ভাল চক্ষে দেখ্‌ছে না।"

"লোকের চোখ নাই তো দেখবে কি? যত সব কূপমণ্ডূকের দল! একই গ্রামের ছেলে মেয়ে কলকাতায় কলেজে পড়ে, একটু দেখা সাক্ষাৎ আর একটু কথাবার্ত্তা বললে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেল?" একটু থেমে শান্তিলতা অচলা দেবীকে প্রশ্ন করে—"তোমার মনে কোন সন্দেহ নাই তো? লোকের সব কথায় কান দিলে ভাল কাজ হবে না মা। যদি এক বছর না যেতে যেতেই পড়া ছাড়িয়ে ঘরে এনে বসিয়ে রাখবে তা হ'লে কি দরকার ছিল সখ করে কলেজে পাঠানোর? তা ছাড়া আমারও বয়স বাড়ছে, আমি কি ভাল মন্দ বুঝি না যে এমন কিছু করবো যাতে নিজেরই অকল্যাণ হবে?"

মা অচলা দেবী শান্তিলতার কথার কাছে পরাজিত হ'লেন। তিনি ভাবলেন—শান্তি কখনই খরাপ কিছু করতে পারে না, সুতরাং তিনি তার পড়া ছাড়ানোর সম্পর্কে আর কোন জিদ্‌ করলেন না।

অচলা দেবী প্রস্থানোদ্যোগ করলে শান্তি বাধা দিয়ে বললো —"মা একটু শোনো, আজ বীরেনদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি, সন্ধ্যাবেলা তাকে এখানে খেয়ে যেতে বলবো। তুমি একটু ব্যবস্থা কোরো।"

যে সন্দেহ একটু আগে প্রায় দূর হয়েছিল বীরেনের নিমন্ত্রণ খাওয়ানোর কথায় তা যেন আবার জেগে উঠ্‌লো, বললেন—"এত লোক থাকতে শুধু বীরেন মন্ডলকে খাওয়ানোর কি দরকার?"

শান্তিলতা হেসে বলে—"তোমাদের এত লোক তো আর কলেজে পড়ে না মা, যদি গাঁয়ের আরও পাঁচটা ছেলে পড়তো তাহলে আজ সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দিতুম।"

মা প্রতিবাদের যুক্তি খুঁজে পান না, "যা ভাল বুঝিস্ কর।" বলে অচলা দেবী ঘর থেকে বিদায় নিলেন। শান্তি শাড়ীটাকে একটু সামলে নিয়ে ব্লাউসের খুলে-যাওয়া বোতামটা বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের চাপে এঁটে দিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরের বৃষ্টির সমারোহ দেখতে লাগলো।

কলকাতায় হোষ্টেলে ফিরে আসার পর বীরেনের সঙ্গে শান্তিলতার মাত্র দু'দিন দেখা হয়েছে। বীরেন সাধারণতঃ শান্তিলতার মামার বাড়ীতে গিয়েই শান্তির সঙ্গে দেখা করতো। শান্তিলতার মামাবাবু কোনো এক সরকারী অফিসে চাকুরী করেন। কাজের চাপে বেশীক্ষণ বাড়ীতে থাকার অবসর তার ছিল না। সকাল ৮½ টায় কোনো রকমে একমুঠো খেয়ে রাত্রি

৮২ টা পর্য্যন্ত তাকে অফিসের ফাইলের মধ্যে ডুবে থাকতে হোতো। শান্তিলতার মামীমা কৃষ্ণা দেবী একাধারে গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রী ছিলেন। এ বাড়ীতে অন্য কোন ছেলে মেয়ে না থাকায় শান্তিলতার খুব বেশী আদর যত্ন ছিল। শান্তিলতার গ্রামের ছেলে—এবং ডাক্তারী পড়ে বলেই কৃষ্ণা দেবী বীরেনকে বেশ খাতির করতেন। বীরেনও তার স্বভাব সুন্দর কথাবার্ত্তা ও ভদ্র ব্যবহারে মামীমাকে সত্যই মুগ্ধ করেছিল। বীরেন কবে মামীমার বাপের বাড়ীর কোন্ রোগীর দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল সেই থেকে কৃষ্ণা-দেবী বীরেনকে সত্যই খাতির কর্তেন। তা ছাড়া হাসপাতালের ছাত্র একজনের সংগে আলাপ থাক্লে বিপদে আপদে অনেক সাহায্য মিলবে এই সত্য স্মরণে থাকায় কৃষ্ণা দেবী বীরেনের প্রতি খাতির যত্নের ত্রুটি কোনো দিনই করেন নি।

বীরেন কলেজ থেকে হোষ্টেলে এসে জামা-কাপড় না খুলেই খাবার ঘরের দিকে গেল। বাইরে যাওয়ার তাগিদ্ থাকায় জামা-কাপড় ছাড়ার তাগিদ্ সে এড়ালো। বীরেন যখন খাওয়ার ঘরে গেল তখন অনেকেই খেতে বসেছে, বীরেন একটা চাটাইয়ে বসে পড়লো। ঠাকুর পরিবেশন করতে করতে আড়চোখে একবার বীরেনের দিকে তাকিয়ে নিল। ভাবটা এই—বাবু একটু দয়া করে বসুন, আপনার খাওয়ার এনে দিচ্ছি। ঠাকুর যথাসময়ে বীরেনের সামনে ভাত ডাল, তরকারী দিয়ে গেল।

বীরেনের পাশে সহপাঠী রাম ঘোষ খাচ্ছিল। বীরেনকে বললো—"কি রে বীরেন, আজ তোর এত দেরী?"

"দেরী তো বেশী হয় নি।" বলে বীরেন আলু ভাজায় কামড় দিল।

"দেরী হয় নি কি রে? আমরা তো কখন ক্লাশ থেকে চলে এসেছি। কত জনের খাওয়া হয়ে গেল। তুই এতক্ষণ কি করছিলি?" রাম অযথা ভাতের শূন্য থালাতে হাত ঘস্‌তে থাকে।

বীরেন বলে, "তাতে কি হ'য়েছে?" বীরেন মুখে এক গ্রাস ভাত দিয়ে রামের মুখের দিকে তাকায়।

"সকাল সকাল এলে যা হয় একমুঠো ভাত খেতে পারা যায়। যত দেরী হ'বে তত আর খাওয়ার জোটি থাক্‌বে না।"

"কেন রে, কাঁকর?" বীরেন উত্তরের প্রতীক্ষা করে। রামচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলে "আরে শেষের দিকে থান ইট্ থাকে! বাচ্চা হিমালয় যেন স্বাধীন বাংলার চালের বস্তা আর ভাতের হাঁড়িতে ঢুকে পড়েছে।"

দুই বন্ধু এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠ্‌লো। বীরেনের মুখের মধ্যে তখনও ভাত ছিল। বেচারী খক্ খক্ করে কাস্‌তে সুরু করলো। কাসি থামলে রাম ঘোষ একটু গম্ভীর হ'য়ে আরম্ভ করলো—"আচ্ছা বীরেন—appendicitis-এর অন্যতম কারণ হিসাবে তো এই কাঁকড় চালকে দায়ী করা চলে। এ একটা নতুন Theory হবে না কি?"

"যা বলেছিস রাম। আমরা যে বেঁচে আছি সেই ঢের। আমাদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে ষ্টীম রোলার চালালে রাস্তা হ'তে পারতো।"

দু'বন্ধু এক সংগে হাত ধুয়ে আসতে আসতে রামচন্দ্র বীরেনকে জিজ্ঞাসা করলো—"কি রে, তুই যে জামাকাপড় না বদ্‌লেই খেতে গেলি, এখন কোথাও বেরুবি না কি?" "হ্যাঁ, দরকার আছে, একটু বাইরে থেকে ঘুরে আস্‌বো।" "তা এই দুপুর বেলা বেড়াতে যেতে হ'বে? লক্ষণ তো ভাল নয়!"

কথা বলতে বলতে দু'জনেই বীরেনের ঘরের কাছে এসে গিয়েছিল। রাম তার নিজের ঘরে না গিয়ে বীরেনের ঘরেই ঢুকে ধপাস করে তার বিছানায় শুয়ে পড়লো।

বীরেন তাগিদ দিয়ে বললো—"ওঠ রাম, আমাকে এখুনি যেতে হ'বে।"

"যা না," বলে নির্ব্বিকার চিত্তে পাশ বালিশটাকে টেনে জড়িয়ে ধরলো রাম।

বীরেন বললো—"যাব কি করে? ঘরে চাবি দিতে হ'বে না বুঝি?"

এবার বিছানায় উঠে বসে রাম জিজ্ঞাসা করলো—"আগে বল তুই কোথায় যাবি। তা না হলে এই এখানে শুলুম।" রাম আবার ধপাস করে শুয়ে পড়লো।

বীরেন কিছুক্ষণ চিন্তা করে একটু হেসে বললো—"আমার এক প্রেয়সী আছে। তার কাছে যাব, হয়েছে তো? ওঠ।"

কিন্তু রামচন্দ্রের ওঠবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। বীরেন ও রামের বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় যে বীরেনের রামের পরস্পরের উপর জোর আপনা থেকেই দু'জনেরই অজ্ঞাতসারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুতরাং বীরেন রামের ওপর জোর করতে পারলো না। রাম বললো—"বল না ভাই, কে সে প্রেয়সী, বল বড্ড দেরী করছিস্! এমন হেমন্ত দুপুরে বন্ধু প্রিয়ার কাহিনী সত্যই আনন্দ দেবে।"

বীরেন বললো—"না, তুই ছাড়বি না দেখ্ছি। কিন্তু তোকে কথা দিতে হ'বে, তুই একথা কাউকে বলবি না?"

"কিন্তু বিয়ের পরে বৌদিকে অর্থাৎ যার গল্প আজ বল্‌বি কেবল তাকেই বলবো।"

"আচ্ছা তা বলিস্!" বলে বীরেন সংক্ষেপে বাড়ুয্যেবাড়ীর ইতিহাস ও তার সঙ্গে নিজেদের মনোমালিন্যের কথা এবং ছুটিতে হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা ও শান্তিলতাকে অঙ্ক আর ইংরাজী শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি বেশ দরদ দিয়ে বলে চললো। রামচন্দ্র মাঝে মাঝে হেসে হেসে প্রেমালাপের গোপন তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে দু'একটা প্রশ্ন করছিল।

বীরেন বল্‌তে বল্‌তে মাঝখানে একবার থেমে গেল। রাম তাড়া দিয়ে বললো "থাম্‌লি কেন বল, কতদূর এগিয়েছিস্? তোদের পূর্বরাগ সত্যি সুন্দর। মাইরি বল্‌ছি! যাকে বলে শঙ্কাভাবিত রোমান্টিক্।"

বীরেন বলে—"আরও শুন্‌বি?"

"তা আর শুনবো না? তোমাদের আখ্যায়িকা কালিদাসের শকুন্তলাকেও হার মানিয়েছে, দুষ্মন্তের আহ্বানই চিরদিন শুনে এসেছি, শকুন্তলাকে তো এভাবে এগিয়ে আস্তে দেখিনি!"

"যা ঘটেছে তাই তোকে বল্‌লাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হ'বে বল দেখি?"

"হ'বে আর কি? লেগেই যখন পড়েছিস্ তখন শেষটাও দেখিস্। তবে কি জানিস্ বীরেন, এ সব চোখের নেশা—কেটে গেলে দু'দিন পরে অবসাদ আসবে; মাঝখান থেকে আত্মীয়-পরিজনের অপ্রিয় হওয়া, অবশ্য যদি সম্মতি মেলে তা হলে আপত্তি নাই। তা না হয় যে কদিন যেটুকু পাস্ ভোগ কর—

'নয়নের দৃষ্টি-টুকু, অধরের হাসি-টুকু
যতটুকু পাও, ততটুকু লও'।"

বীরেন কোনো কথা বলে না। তার বুক ঠেলে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি বলে—"এই-যা! বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে।" বীরেন যাওয়ার জন্য পা বাড়াল, রামও উঠে দাঁড়াল, বললো—"দেখ্ বীরেন, বন্ধু হিসাবে তোকে সর্ব্বশেষে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই।"

একটু থেমে রাম আরম্ভ করলো—"দেখ, আমার কথা হয়ত তোর মনে ধরবে না। কারণ তোর মন এখন মোহে ভরা। যা হোক্ যদি সম্ভব হয় বন্ধুর কথাটা দয়া করে মনে রাখিস্।"

বীরেন তাগিদ দিয়ে বলে "কি বলবি বল না।"

"হ্যাঁ, বলছিলাম কি—আমরা সব সাধারণ মানুষ। এই প্রেমট্রেম করাটা ঠিক আমাদের মানায় না। আমাদের ভালবাসাটা বিয়ের পরে হলেই যেন সব দিক থেকে চমৎকার হয়। যাক্ বীরেন, আমি তোকে নিরুৎসাহ করছি না। হয়ত তোর মনে হবে আমি অনেক বড় কথা বলছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, তোর ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসা আছে বলেই তোকে আমি অসাধারণ কিছু দেখতে চাই। যা হোক্ তুই চিন্তা করে দেখিস আমার কথাগুলো। আজ আমরা তোমাকে তোমার ভালমন্দর বিষয় আমাদের ছোট বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বলতে পারি। কিন্তু তার গৌরব ও ব্যথা যে তোমার নিজস্ব হয়ে থাক্‌বে। ভগ্ন হৃদয়ের অনুশোচনার দিনে কাউকে কাছে পাবে না। নিরাশায় নির্জ্জনে বসে চোখের জল মুছতে হবে, যা হোক্ আজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার প্রেম সার্থক হোক্ —সুন্দর হোক্—পরিণতি লাভ করুক।"

বীরেন এতক্ষণ রামের কথাগুলি তন্ময় হ'য়ে শুনছিল। হঠাৎ সে ভাব কেটে গেলে রামকে উদ্দেশ্য ক'রে বললো—"দেখ রাম, আজ যে খেলা প্রাণের আবেগে সুরু করেছি তা যেন সম্মানের সঙ্গে সমাপ্ত হয়, নতুবা যেন শ্রদ্ধায় তাকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি আমার থাকে।"

বীরেন বাহিরে যাওয়ার জন্য চাবি হাতে এগিয়ে এল, পিছনে রাম, দরজার কাছে এসেই দেখে তাদের গ্রামের ছেলে

সমর। বয়স বীরেনের চেয়ে দু'এক বছরের বড়। কিন্তু দেখ্‌লে মনে হয় অনেক বড়।

বীরেনকে দেখেই বললো—"এই যে বীরেনদা, তোমার কাছে সোজা চলে এলুম।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কি ব্যাপার বল্‌ দেখি, হঠাৎ যে এসেছিস্‌? বাবা, মা, আমাদের বাড়ীর সবাই ভাল আছেন তো?" বীরেন সমরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু থেমে বলে—"আয় ঘরের মধ্যে আয়, বস এই বিছানায়, সমর ও বীরেন ঘরের মধ্যে যায়, রাম বিদায় নিয়ে প্রস্থান করে। বীরেন জিজ্ঞাসা করে, "ব্যাপার কি বল তো সমর? বিশেষ কি দরকার পড়েছে?"

সমর দরকার ছাড়া যে হঠাৎ বীরেনের খোঁজ নিতে এসেছে একথা বিশ্বাস করার কোন হেতু নাই। একই গ্রামের ছেলে সেও, তাকে তো বীরেনের চিন্‌তে বাকী নাই। নেশা-ভাঙের মধ্যে দিয়ে সে দিন কাটায় আর পৈতৃক সম্পত্তির ওপর বসে বসে খায়। বীরেনেরই পাল্লায় পড়ে মহামারীর সময় সে একটু গ্রাম-সেবায় লেগেছিল, কিন্তু লোকের উপকার যা করেছিল ক্ষেত্র-বিশেষে অপকারও করেছিল অনেক বেশী। নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে তার নামে অনেক কথাই বীরেনের কানে এসেছে. কিন্তু যদি মানুষের মন না বদলায় তবে কেবল উপদেশ আর শক্তিতে এ ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব নয় বলেই বীরেনের ধারণা। তা ছাড়া শান্তিলতার সঙ্গে তার আলাপ হওয়ার পর থেকে বীরেন

নর-নারীর প্রেমালাপের ব্যাপারটাকে সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার বলে গণ্য করেছে। একটি ছেলে একটি মেয়ের প্রতি আসক্ত একথা শুনে আজ আর তার বিস্ময় লাগে না। তখনই সে নিজেকে দিয়েই বিচার করে। অন্যকে দোষ দেওয়ার প্রবৃত্তি তার অন্তর্হিত হয়।

যা হোক্ সমরকে নীরব থাকতে দেখে বীরেন আবার প্রশ্ন করে—"কি দরকার ভাই সমর? কিছু খাবি?"

"না বীরেন, খাওয়ার কিছু দরকার হ'বে না। আসল কথা শোনো।" একটু থেমে সুরু করে—

"সেই যে তোমাদের বাড়ীর কাছে হারু মোড়ল থাকে; তোমাদের দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতি না কি হয়। জমিদারের ধামাধরা—"

"হ্যাঁ তা তো হয়; কিন্তু তার কি হয়েছে, তাড়াতাড়ি বল।"

"তাকে যে এখানে নিয়ে এসেছি।"

"কেন তাকে এনেছিস্? তার আবার কি হোলো?"

"সে যে মরতে বসেছে বীরেন, তার গলায় ক্যানসর না কি হয়েছে। ডাক্তাররা বললেন দেশে ওরোগ সারবে না। কলকাতায় দেখাতে হবে তাই সঙ্গে নিয়ে এলুম। আমি তো জানি তুমি আছ, যা হয় একটা ব্যবস্থা হবেই। বুড়োর তো কেউ-ই নাই, একটি আইবুড়ো মেয়ে আবার ঘাড়ে।"

"এখানে তাকে কোথায় রেখেছিস্?"

"কোথায় আর রাখবো—ঐ চৌরাস্তার মোড় দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে, আমার পিসতুতো বোনের দেওররা ওখানে থাকে বাসাবাড়ীর মত, সেখানে বলে কয়ে জায়গা ক'রে নিলুম, তারা কি আর দিতে চায়?"

"আচ্ছা চল্‌ তবে দেখে আসি কি করা যায়?" সমরকে নিয়ে বীরেন বেরিয়ে পড়ে। মনে কিন্তু তখন তার শান্তিলতার কথা জেগে আছে। ভেবেছিল আজ ছুটির দিন—হঠাৎ পাওয়া কলেজের ছুটী—দুপুর বেলা শান্তিলতার সঙ্গে গল্পগুজবে কাটানোর বেশ চমৎকার অবসর। কিন্তু সব মাটি হ'য়ে গেল। বীরেন চিরকালই পরোপকার করে এসেছে, তার মন সেই ভাবে তৈরী। সুতরাং শান্তির সঙ্গে অবসর বিনোদনের চমৎকার সুযোগের কল্পনা তার মন থেকে সরে গেল। হারু মণ্ডলের রোগ আবিষ্কারের বিষয় তার মনকে আচ্ছন্ন করে বস্‌লো, সে সমরকে জিজ্ঞাসা করলো—"হ্যাঁ রে সমর, তুই ক্যানসার না কি বলছিলি?"

"হ্যাঁ, তাই তো বললুম—ডাক্তাররা বলেছে যে।"

বীরেন হেসে উঠলো, বললো—"তাই না কি? যাক্‌ এখান থেকে কত দূরে সেই বাসা রে?"

"তা এই কাছেই; যদি হেটে যেতে কষ্ট হয় তা হ'লে একটা গাড়ীটাড়ি"—হঠাৎ একটা রিক্সা দেখে সমর চিৎকার করতে সুরু করলো—"এই—এই—"

বীরেন হেসে বাধা দিয়ে বললো—"আরে থাক্ থাক্, আর গাড়ী দরকার নেই।"

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ চলতে আরম্ভ করলো। কিছু দূর যাওয়ার পরে বীরেন জিজ্ঞাসা করলো—"হারুকাকাকে কি একলা এনেছিস্?" গ্রামসুবাদে হারুকে বীরেন ছেলেবেলা থেকে কাকা বলেই ডাক্‌তো।

সমর একটু থেমে হেসে বলে—"একলা আনবো তো তার ধেড়ে মেয়েটা থাকে কোথায়? গ্রামের যা সব দুষ্টু লোক। তা ছাড়া সে তার বাবাকে ছেড়েও থাকতে রাজী হোলো না। তাই তাকেও সঙ্গে আন্‌তে হোলো।"

বীরেন একটু যেন চমকে উঠলো। সমর তা হ'লে হারু-কাকার উপকার করছে। তার মেয়ের কাছ থেকে সুদে-আসলে প্রত্যুপকার আদায়ের আশায়। যা হোক্ সে জিজ্ঞাসা করলো —"হ্যারে সমর, হারকাকার মেয়ের নাম কি বল দেখি, অনেক দিন দেখিনি নাম ভুলে গেছি।"

"দেখনি, আজ দেখ্‌বেখন; অনেক বড় হয়েছে, দেখতে শুনতে মন্দ নয়—নাম পাঁচু।"

বীরেনের খুব রাগ হচ্ছিল সমরের কথায়, কিন্তু কি করবে ওদিকে হারুকাকার বিপদ, এই বিপদে অন্য কেউ-ই তো এগিয়ে যায় নি। তবু তো সমরের যে দুরভিসন্ধি থাকুক না কেন কলকাতায় তাকে এনেছে, এবং একটা বাসা যোগাড় করে তাকে আশ্রয় দিতে পেরেছে, এইটাই বা কে করে? মুহূর্তেই

সমরের প্রতি বীরেনের রাগের ভাব অন্তর্হিত হোলো। যতই পথ হাটে তত যেন পথ আর শেষ হয় না। বীরেন বললো "কি রে সমর, কোথায় নিয়ে চল্‌লি?"

"এই তো, এসে গেলুম!" বলে সমর আরও একটু জোর পা চালিয়ে দেয়।

"দুত্তোর, তুই তো আমাকে অনেক দূর নিয়ে এলি? এ যে চিৎপুর রে! তবে যে বললি চৌরাস্তা পার হয়ে?"

"তা কি করবো বল, আমি কি ঠিক করে বলতে পারি, সহরের কি সব রাস্তা তোমাদের। গাড়ী ঘোড়া গিস্‌ গিস্‌ করছে। আমার তো সব সময় মনে হয় চাপা পড়লুম আর কি?"

বীরেন হেসে ওঠে, বলে—"গাঁয়ের রাস্তাগুলো তোর বেশ ভাল না রে? কোন ভীড় নাই গোলমাল নাই, নিরিবিলি, কি বল?" দুজনেই চুপচাপ। বীরেনের মনে তখন গাঁয়ের ছবি। —শীর্ণ খালের ধারের সেই তার আর শান্তিলতার আলাপের জীবন্ত চিত্র। বীরেন ভাবে হা রে পল্লীগ্রাম। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আর তুমি কত দিন ডুবে থাক্‌বে? কবে তোমার ঘরে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করবে। অতীতে সেখানে আধুনিক শিক্ষা প্রবেশের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সেখানে তো প্রাচুর্য্যেরও অভাব ঘটে নি, আজকের অভাব সব কিছুর। আবার কবে তোমার পূর্ণ জীবনের মধ্যে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখ্‌বো, সহর-জীবনের বাঁধা ধরা কার্য্যক্রমের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে তোমার

বুকে ছুটে যাই। কিন্তু তুমিও আজ সহরের ছোঁয়ায় তোমার অতীতের রূপকে হারিয়েছ। ক্লান্তি, অবসাদ দূর করার কোনো কিছুই খুঁজে পাই না তোমার মধ্যে, তোমার অতীত ছবির কথা আজ ঐতিহাসিক ঘটনায় পর্য্যবসিত, জীবন যুদ্ধের মাঝে দাঁড়িয়ে তো তোমাকে সেই অতীতের ঐশ্বর্য্যশালিনী রূপে কল্পনাও করতে পারি না। তুমি কি মা আমাদের সেই সাধের পল্লী?

সমরের ডাকে হঠাৎ বীরেনের চমক ভাঙে। "দেখ বীরেন, কত লোক বোতল হাতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।" তখন বীরেনের মনে পল্লীগ্রামের কথা তোলপাড় করছিল, তাই একটি ছোট্ট উত্তর দিয়ে—"তা তো দেখ্‌ছি" বলে এড়িয়ে গেল। পাশ দিয়ে ভীড় ঠেলে একটা লোক আপন মনে কি বলতে বলতে চলে গেল।

সমর জিজ্ঞাসা করলো—"লোকটা কি বল্‌ছিল বীরেন?"

"তাই তো রে! এ যে মদের দোকানে লাইন।" বিস্মিত ভাবে বীরেন বলে।

"দেখ দেখ বীরেন, লোকগুলো কি রকম ঠেলাঠেলি করছে।" সত্যি সে যেন রীতিমত একটা ছোটখাটো যুদ্ধ বেঁধে গেছে।

বীরেন বললো—"ওঃ, লোকগুলো আজ কি স্তরে নেমে এসেছে, প্রাণ গেলেও দুঃখ নাই, মদ চাই, সংসারে ছেলেমেয়েরা একমুঠো ভাত মুড়ি পেল কি না তা দেখবার দরকার নেই, মদ

না হ'লে চলবে না। মানুষকে এই পশুপর্য্যায়ে নামিয়ে নিয়ে এল কে?"

যেতে যেতে হঠাৎ থেমে সমর বীরেনকে বললে—"এই দিক দিয়ে এস, এই গলির মধ্যে।" গলির মধ্যে দু'জনে ঢুকে পড়লো। একটা সরু গলি, ঘর বাড়ী দেখলে মনে হয় আশে পাশে বেশ সম্ভ্রান্ত লোক, কিন্তু গলির অবস্থা দেখ্‌লে সত্যই দুঃখ হয়। রাস্তাটা অন্ধকার, সব সময়ই প্রায় স্যাঁতসেঁতে থাকে, কোনো কালে সূর্য্যদেব এখানে উঁকিও দেন নি মনে হোলো। বীরেন আবার ভাবলো তার পল্লীর কথা, মনে হোলো নগর-জীবনের এই বন্ধ হাওয়ার চেয়ে পল্লীর খোলা মাঠ তার শত দারিদ্র্য ও নগ্নতা সত্ত্বেও মানুষের দিন অতিবাহিত করার পক্ষে ঢের ভাল ও সুন্দর। চিন্তা করতে করতে সমরের সঙ্গে বীরেন একটা ছোট দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। সমর জোরে জোরে দরজাটাকে ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সমর ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং বীরেনকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করলো।

ঘরের মধ্যে তখন কাউকে না দেখে বীরেন একটু বিস্মিত হোলো। হঠাৎ এক কোণে একটি ছেঁড়া বিছানায় হারু-কাকাকে আবিষ্কার করে তার দিকে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ কি বলবার জন্যে বারে বারে হা করছে, কিন্তু কিছুই বল্‌তে পারছে না। বীরেন তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"কি গো হারুকাকা, তোমার আবার কি হোলো? কত দিন

তোমার অসুখ করেছে, আগে তো জানাও নি?"

বীরেনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বৃদ্ধ কি বলতে চেষ্টা করলো ; কিন্তু পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারলো না। হারু মণ্ডল বীরেনকে চিনতে পেরেছিল—মনের মধ্যে তার বহু কথা ভীড় করেছিল, ইচ্ছা হচ্ছিল বীরেনকে সব উজাড় ক'রে বলে। চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা তখন তার ছিল না। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। বীরেন তার হারুকাকার অবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হোলো। অবস্থা দেখে বীরেন বৃদ্ধকে কথা বলবার চেষ্টা করতে নিষেধ করলো এবং যতদূর সম্ভব সত্বর তার চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রস্থানোদ্যোগ করলো। বীরেনকে উঠতে দেখে সমর ব্যস্ত হয়ে বললো—"সে কি বীরেন, এরই মধ্যে তুমি চলে যাবে, তা হয় না, একটু বস।"

"না, না, এখন বসতে পারবো না, তোমাকে তো বলেই এসেছি আমার জরুরী কাজ আছে—এক্ষুনি যেতে হ'বে।" ব'লে বীরেন মুখ ফেরালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল তার হারুকাকার পঞ্চদশী কন্যা পঞ্চুর সঙ্গে, সে ততক্ষণে বীরেনের জন্যে একটি ছোট্ট রেকাবীতে দেশ থেকে আনা দু'টি নারকেল নাড়ু সাজিয়ে এক গেলাস জল নিয়ে হাজির। "বীরেনদা, এগুলো দেশ থেকে এনেছি, খেয়ে নিন।" পঞ্চুর কথার মধ্যে জোর ছিল, সেই কারণে বীরেনের পক্ষে সে অনুরোধ এড়ানো সম্ভব হোলো না। বীরেন নারকেল নাড়ু

ও জল খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। পণ্টু তাকে প্রণাম করে বললো —"বীরেনদা, আমাদের কেউ নেই আপনি তো জানেন, বাবাকে বাঁচিয়ে তুলোন। ছোট বোনের এই আবেদন আপনি অগ্রাহ্য করবেন না আমি জানি। গ্রামের মানুষের মহামারীর দিনে, আপনাকে যে ভাবে সেবা করতে দেখেছি তাতে আপনার কাছেই রোগের সাহায্য মিলবে ভেবে শত অসুবিধা সত্ত্বেও কলকাতায় বাবাকে নিয়ে চলে এসেছি। দয়া করে আপনি যা করতে হয় করে দিন।" পণ্টু এমন ভাবে কথাগুলো গুছিয়ে বললো যে, বীরেনের মনে হোলো কে যেন পণ্টুকে কয়েকদিন ধরে এগুলো মুখস্থ করিয়েছে। কিন্তু বীরেনের বোঝা উচিত ছিল কথা বলার জন্যে মেয়েদের শেখাতে হয় না। এটা তাদের জন্মগত অধিকার, তা ছাড়া দুঃখের বর্ণনা এদের মত বিশ্বের অন্য কোন প্রাণী পারে না। যা হোক্, বীরেন সাধ্যমত চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল।

গতানুগতিক জীবনযাত্রার পথ বেয়ে কটা মাস কেটে গেছে। আজ রবিবার, সকাল থেকেই বীরেন একটু ব্যস্ত। দেশ থেকে চিঠি এসেছে—গজেন্দ্র জানিয়েছে—মায়ের অসুখ. বীরেন একবার গেলে ভাল হয়। তাই বীরেন ছুটীর অপেক্ষা না ক'রে দেশে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে বই খাতা গুছিয়ে রাখতে লাগলো। মায়ের অসুখ যখন তখন কিছু ফল কিনে নিয়ে যাওয়া চাই। মায়ের অসুখের সংবাদে বীরেন সত্যই বিচলিত হ'য়েছিল, মায়ের অফুরন্ত আদর যত্নের মধ্যে যে মানুষ, সেই

স্নেহশীলা জননী আজ পীড়িতা। বীরেন ব্যস্ত হোলো. ছোট খাটো অসুখ করলে তো দাদা চিঠি দিতেন না। নিশ্চয়ই কিছু বাড়াবাড়ি হ'য়েছে। বীরেন যতই ভাবতে লাগলো ততই তার মন বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

মনোতোষ রায় বীরেনের সহপাঠী। রবিবার সকালে বীরেনের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার জন্যে এসে হাজির। কিন্তু বীরেনকে ব্যস্ত দেখে আড্ডা দেওয়ার উৎসাহ পেল না. বীরেন দেশে যাবে শুনে মনোতোষ মন্তব্য করলো—"তোরা বেশ মজায় আছিস্! দেশ থেকে চিঠি এল আর টিকিট কেটে সরে পড়লি।"

"তোরাও তো বেশ আছিস্! প্রবাস জীবন যাপন করতে হয় না।"

সুটকেশের মধ্যে কাপড়জামা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বীরেন উত্তর দেয়।

"সে কথা সত্যি, কিন্তু এত একঘেঁয়ে জীবন ভাল লাগে না। এতে কোন নূতনত্ব নাই।"

"নূতনত্ব নিয়ে লাভ নেই মনোতোষ ; বেশ আছিস্।"

"দেশ কি রকম সুন্দর। গ্রামের প্রতি পথে ঘাটে গাছ পালায় প্রকৃতির কল্যাণ-হস্তের ছোঁয়া দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর সহর, সহরতলীতে তার কোন সম্ভাবনাই নাই। সেখানে আছে প্রাণ-মাতানো শান্তি।"

"তুই যে রীতিমত কাব্য সুরু করলি মনোতোষ ; বাইরে থেকে দেখতেই গ্রামকে ভাল, কিন্তু সেখানে সমাজ-জীবনে আর

মানুষের মনে যে তীব্র হলাহল আছে তা কি তোরা কোন দিন উপলব্ধি করবি না?"

বিস্মিত মনোতোষ উত্তর দেয়—"তুই কি হেঁয়ালি করছিস্ আমি তো বুঝতে পারছি না। চিরদিনই কাব্যে সাহিত্যে উপন্যাসে পড়ে এলুম গ্রামের মানুষেরা অত্যন্ত সরল, ডাক্তারী পড়তে পড়তে বহু গ্রাম্য রোগীর সংস্পর্শে এসেছি। তাদের প্রায় সবাইকে সরল মনে হয়েছে।"

"দেখ মনোতোষ, তুই যাদের সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হয়েছিস, তারা সব রোগী। রোগীরা রোগীই, তার মধ্যে সহর আর গাঁ নেই। তবে কি জানিস পল্লীর সাধারণ মানুষগুলো সত্যই সৎ ও সরল। কিন্তু যারা অল্প লেখা পড়া শিখেছে এবং যাদের দু-পয়সা আছে তাদের শয়তানীর জন্যে গ্রাম্য জীবন দিনে দিনে দুর্ব্বিষহ—হয়ে উঠছে।"

"তাই নাকি রে?" বিস্মিত মনোতোষ প্রশ্ন করে। কিন্তু কেন এমন হয় বলতে পারিস্?"

"সমাজ-মর্য্যাদা বুঝলি?" বলে বীরেন সুটকেশ বন্ধ করে। মনোতোষ জোর দিয়ে বলে "দেশ স্বাধীন হয়েছে এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমারও সেই ধারণা ছিল। দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাবার পরে সমাজের যে নতুন কাঠামো তৈরী হবে তাতে মানুষ স্বীকৃতি পাবে। চারিদিকে প্রাণের প্রাচুর্য্য দেখা যাবে, কিন্তু ভাই, আজ সব চিন্তা সব কল্পনা যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে,—

মানুষ দিনে দিনে শয়তান হয়ে চলেছে। আমার ভয় হয় কি জানিস্? ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্যে পড়ে মানুষ আবার সেই আদিম যুগে ফিরে যাবে।"

"কালের গতিতে সব ঠিক হ'য়ে যাবে, বীরেন।" বলে মনোতোষ নস্যের ডিবে খুলে দু'টি আঙ্গুল চেপে নস্যি নিল। পকেটে নস্যির কৌটা রেখে, বাঁ হাত দিয়ে নস্যিমাখা রুমালসহ বাঁ দিকের নাকটা চেপে ডান দিকের নাকে পরম স্বস্তির সঙ্গে চোখ বন্ধ করে নস্যি গুঁজ্‌তে লাগ্‌লো।

ভাল শ্রোতা পেয়ে বীরেন বলতে আরম্ভ করলো—"দেখ মনোতোষ, তুই কখনো গ্রামে যাস নি বলেই গ্রামের সম্বন্ধে তোর বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। আমারও শ্রদ্ধা কম নাই, কিন্তু সমাজ-জীবনের এমন জটিলতা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে যে তখন সব গোলমাল হ'য়ে যায়। মানুষের এই ব্যবধান কে যে সৃষ্টি করে গেল তার হদিস পাই না। কর্ম্মের বিচারে এক দিন মানুষের স্তর ভাগ হয়েছিল। কিন্তু সেই ভাগের জের টেনে আমাদের চলতে হচ্ছে। হয়ত আরও বহু অনাগত দিনের মানুষকে তার জের টেনে যেতে হ'বে এবং সমাপ্তি কোথায়, মানুষের অতৃপ্ত আকাঙ্খার মুক্তি কোথায় তা তো বুঝতে পারি না : মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা একেবারে পথ হারিয়েছি।" কিছু-ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বীরেন বলে—"তবে কি জানিস্ মনোতোষ, এই থেকে মুক্তি পাওয়ার তিনটি পথ আছে—আমি খুঁজে পেয়েছি।"— মনোতোষ হাতে রাখা নস্যির শেষ অংশ জোরে টেনে

নিয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে বীরেনের দিকে তাকিয়ে থাকলো। বীরেন বললো—"দেখ মনোতোষ, আমার ছোট বুদ্ধিতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি যে, তিনটি উপায়ে এই সমাজ-জীবনের জটিলতা সমাধান করা সম্ভব—প্রথম হচ্ছেঃ জন্মের পর থেকে রাষ্ট্রের প্রত্যেক শিশুকে একই বিদ্যামন্দিরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কোন দিনই তাদের স্বাভাবিক সুযোগ থাক্‌বে না নিজেদের জন্মসূত্রকে আবিষ্কার করার,—তারা বংশসূত্রকে জীবনের মুখ্য পর্য্যায়ে ফেলে হানাহানি না করে ভারতের কোটি কোটি মানুষের সেবক, দেশের ভাবী সৈনিক ও প্রাণশক্তির উপাসক হবে, এই হবে তাদের পরিচয়। দেখিস্ সমাজের ছোট প্রাচীরগুলো আপনি ভেঙে যাবে। দ্বিতীয় হচ্ছে—কঠোর আইনের সাহায্যে চল্‌তি জাতিভেদ প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন ক'রতে হ'বে। যোগ্যতাই মানুষের মাঝে যে স্বাভাবিক ব্যবধান রচনা করেছে তার উপর আর জাতের প্রাচীর খাড়া করার কোনো আবশ্যকতা নাই। তৃতীয় হচ্ছে—সৃষ্টির চেয়ে কৃষ্টিকে বড় মর্য্যাদা দিতে শিখ্‌তে বা শেখাতে হ'বে। বিকাশ—পূর্ণ বিকাশই মানুষকে তার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করুক, জন্মের স্থান কাল পাত্র ভেদে সে আসন নির্দ্দিষ্ট হওয়ার কোন যুক্তি নাই, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার ভয় ও সংশয়ের ছাপ ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে হ'বে।" বীরেন বক্তৃতার ঢং-এ একথাগুলি বলেই মনোতোষকে লক্ষ্য করে আবার বললো—"এই যা, দেরী হ'য়ে গেছে, এ সম্বন্ধে তোর সঙ্গে অন্য এক দিন

আলোচনা করবো, এখন ভাই একটু বেরুতে হ'বে। আজ বিকেলে দেশে যাব—মায়ের অসুখ।" মায়ের অসুখের কথা মনোতোষ এতক্ষণ শোনে নি, এবারে সত্যই ব্যস্ত হোলো—"এঃ তোর দেরী করিয়ে দিলুম—ভগবান করুন মা তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করুন, যদি তোর ফির্তে দেরী হয় তা হ'লে পত্র দিস কিন্তু।"

দেশে যাওয়ার আগে শান্তির সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার জন্যে মনটা খুবই উৎসুক হ'য়ে উঠ্লো। বীরেন আর দেরী না করে গ্রে ষ্ট্রীটের উদ্দেশ্যে সামনে পাওয়া ট্রামেই চড়ে বস্লো। মনে মনে ভাবলো—যদি শান্তি এবারে কোন চিঠি নিয়ে যেতে বলে সে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে, কারণ গতবারের চিঠি নিয়ে গিয়ে অচলা দেবীর কাছে সে যে আঘাত ও অপমান লাভ করেছে তার স্মৃতি তার কাছে আজও টাট্কা।

ট্রামে যেতে যেতে বীরেন ভাব্লো মায়ের অসুখে সত্যি মন চঞ্চল। এ অবস্থায়ও শান্তির আকর্ষন বড় হোলো কি করে? সত্যি নারীর রূপ এত পাগল করে মানুষকে, মোহ এমন উদ্ভ্রান্ত ক'রে মনকে? মনে লাগা মেয়ের জন্যে আচ্ছন্ন হয় বিবেক। অথচ ঠিক মত এদের মন বোঝা যায় না। তাই বোধ হয় কবিকে বলতে হয়েছে—"অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।" বীরেনের ইচ্ছে হোলো সে বিবেককে চাবুক লাগিয়ে শান্তির কাছ থেকে ফিরিয়ে নেয়; কিন্তু অজানা

শক্তি যেন তাকে শান্তির মামার বাড়ীর দিকেই টেনে নিয়ে গেল। বীরেনের ফেরা হোলো না।

"খট্ খট্" করে দরজায় কড়া নাড়া দিল বীরেন। ভেতরে শোনা গেল পরিচিত পদধ্বনি, শান্তি স্বয়ং এসে দরজা খুলে দিল—বীরেনকে দেখে হেসে বললো—"কড়া নাড়ার কায়দা দেখেই বুঝেছিলুম তুমিই।—তা এস এমন মুখ শুক্‌নো কেন? বীরেন ভেতরে এলে শান্তি দরজা বন্ধ করে দিল। শান্তিলতা নিরালায় অর্থাৎ দু'জনে যখন একলা একলা থাকে তখন তুমিই বলে, আর পাঁচ জনের সামনে "আপনির" ব্যবধান রচনা করে ভদ্রতা ও সামাজিকতা রক্ষা করে। এই লুকোচুরিতে দু'জনেরই সমান আনন্দ। বাইরের ঘর থেকে পাশের ঘরে যেতে যেতে শান্তি জিজ্ঞাসা করে—"তা এই অসময়ে যে?" "তা আস্‌তে নাই না কি?"

"আমি কি তাই বল্‌ছি না কি?"

এতক্ষণ তারা পাশের ঘরে এসে হাজির হয়েছিল, বীরেন এদের এ বাড়ীতে প্রথম আসার দিন থেকেই এই ঘরে বসে গল্প গুজব করে; খায়-দায়, অতএব এর সব জিনিষ তার অত্যন্ত পরিচিত, আজ ঘরে ঢুকেই সে এক অপরিচিত জিনিষ দেখে একটু চম্‌কে উঠলো। শান্তিলতার সহপাঠী অপর্ণাকে চুপ করে বসে থাক্‌তে দেখে পিছন ফিরে চলে যাওয়ার ভাণ করলো। শান্তিলতা বীরেনের হাত ধরে হেসে বলে উঠলো—"ও কি বীরেনদা, লজ্জা পেয়ে সরে পড়ছেন কেন? আসুন, এর সঙ্গে

আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।" বলে বীরেনকে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। অপর্ণা ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠেছিল—শান্তি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ঢং-এ বললো—"ইনি আমার অন্যতমা অন্তরঙ্গ বান্ধবী, আমাদের Class-এর সেরা ও কৃতী ছাত্রী—নাম অপর্ণা গাঙ্গুলী।" অপর্ণা শান্তি-লতাকে ঠেলা দিয়ে বলে—"ঢের হয়েছে, আর অত পরিচয় দিতে হ'বে না। সহপাঠী বল্‌লেই চল্‌বে।"

"বারে! তুই কি কেবল আমার সহপাঠী না কি, সহচরীও তো বটে। সময় অসময়ে এসে এমন আড্ডা জমায় কে?"

"তা ছাড়া কলেজ পালানোর জন্যেও আপনাকে দরকার হয় নিশ্চয়ই।" বীরেনের ইঙ্গিত দু'জনেই বুঝলো এবং এক সঙ্গে হেসে উঠ্‌লো।

শান্তিলতা বললো—"দেখ ভাই অপর্ণা, এ'র পরিচয় তো তোকে দেওয়া হোলো না।"

অপর্ণা বাধা দিয়ে বললো—"ও'র পরিচয় আর দিতে হ'বে না, ইনিই সেই বীরেন বাবু যাঁর গল্প করতে সুরু করলে তোর জ্ঞান থাকে না।" অপর্ণা বীরেনের দিকে তাকিয়ে আবার সুরু করলো—"জানেন বীরেনবাবু, শান্তি আপনার এত গল্প আর সুখ্যাতি করেছে যে আপনার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের না থাকলেও আপনি আমার কাছে অপরিচিত নন।" শান্তিলতা এতক্ষণ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছিল—বীরেনের প্রতি শান্তিলতার

ভালবাসার এমন সার্টিফিকেট্ অপর্ণা দিয়েছে যে তাতে দু'জনেই খুব খুসী হোলো।

কথাবর্ত্তা শুনে পাশের ঘর থেকে মামীমা বললেন—"শান্তি, কে কথা ব'লে রে, বীরেন না?"

"হ্যাঁ, মামীমা।"

"ওকে বস্তে বল, যেন আমার সংগে দেখা না ক'রে চলে যায় না।"

শান্তি বীরেনের দিকে তাকিয়ে হেসে বল্লো—"কি, শুনতে পেলেন তো?"

"তা আমি শুনি বা না শুনি তুমি তোমার কর্ত্তব্য করবে তো, তোমাকে বলতে বলেছেন তুমি বলে দাও।" শান্তি হাসতে হাস্তে বললো—"ধীর ভাবে শুনুন; মামীমা তার প্রিয়—প্রিয় শিষ্য আপনাকে তার সংগে দেখা না ক'রে প্রস্থান করতে নিষেধ ক'রেছেন। হোলো তো?" সবাই এক সংগে হেসে উঠলো।

শান্তির সংগে অপর্ণার আলাপটা কলেজের গণ্ডী ছাড়িয়ে আরও একটু দূর গিয়েছিল। শান্তি একাধিকবার অপর্ণাদের বাড়ী গেছে। বাড়ীর প্রায় সবার সংগে ওর আলাপ পরিচয় ঘটেছে। ওদের বাড়ীতে আজকাল গেলে যেন শান্তির মনে একটা সন্দেহ জাগে। মনে হয় অপর্ণা এবং তার মা যেন স্নেহ-জাল বিস্তার করে, তাকে একান্ত আপন করে ধর্তে চায়। অপর্ণার অবিবাহিত ইঞ্জিনিয়ার বড়দা সুকোমলবাবুর

স্মৃতি

উপযুক্ত পাত্রী হিসাবে শান্তি ইতিমধ্যে এদের মনের কোণে যেন একটা রেখাপাত করেছে। শান্তিলতা তাদের মনোভাব বুঝেছিল—কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন দিন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে নি। তবে সুকোমলবাবু যে সত্যই একজন উপযুক্ত পাত্র এবং বাংলাদেশের যে কোনো কুমারীর পাণিগ্রহণের যোগ্য একথা শান্তিলতা মনে মনে স্বীকার করেছিল। অপর্ণা শান্তির মুখে বীরেনের বহু গল্প শোনা সত্ত্বেও বিশ্বাস করে নি যে বীরেনকে সে স্বামী রূপে পেতে চায়। তার কারণ ছিল একাধিক—প্রথম কারণ—বীরেন ও শান্তির মধ্যে জন্মগত জাতীয় পার্থক্য বিদ্যমান, যা শুনেছে তাতে বীরেনদের অবস্থা খুব ভাল নয়। অন্ততঃ অপর্ণাদের মত তো নয়। এই সব কারণে শান্তিলতাকে বৌদি রূপে পাওয়ার স্বাভাবিক কল্পনাপথের ছোট্টখাটো বাঁধাগুলো অপসারিত হয়েছিল।

শান্তিলতার মামীমা ঘরে এসে একটি চেয়ারে বসলেন। বীরেন উঠে তার অভ্যাসমত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। "দীর্ঘজীবি হও, মানুষের মত মানুষ হও।" একটু থেমে বললেন—"খবর কি বীরেন? ভাল তো?"

"আমি নিজে ভাল আছি, কিন্তু বড় দুর্ভাবনায় পড়েছি মামীমা।" বলে বীরেন হাতের খবরের কাগজখানা টেবিলের ওপর রাখলো।

"তোমার আবার দুর্ভাবনা কি বাবা?"

"দাদা চিঠি লিখেছেন, মায়ের অসুখ, আমাকে যেতে বলেছেন।"

"তা তো ভাবনার কথা! তুমি কবে যাচ্ছ?" উত্তর শোনার জন্যে মামীমা অপেক্ষা করলেন।

"বৈকালের গাড়ীতেই যাব ঠিক করেছি, কারণ তার আগে তো কোন গাড়ী নাই।"

"শান্তিকেও দেশে পাঠাতে হবে, ওর মা জরুরী চিঠি লিখেছে। ওর মামাবাবুরও সময় নাই, যদি তুমি ওকে সংগে নিয়ে যাও।" একটু থেমে মামীমা বললেন, "কিন্তু ও তো বৈকালেই যেতে পারবে না। আর তোমারও তো অপেক্ষা করা চলবে না।" বীরেন একটু চিন্তা করে উত্তর দিল—"যদি কাল ভোরের ট্রেনে যাওয়া হয় তা হ'লে আমি কোন রকমে কয়েকটা ঘন্টা দেরী করে যেতে পারি।" সংগে সংগে বীরেনের মনে পড়ে গেল গত পূজার ছুটীতে শান্তির একখানা চিঠি নিয়ে যেতেই অচলা দেবী চটে গিছলেন। এবারে আর চিঠি নয় স্বয়ং রক্ত-মাংসের শান্তিলতাকে সংগে নিয়ে যেতে হ'বে। বীরেন একবার ভাবলো—এ ঝুঁকি না নিলেই হোতো, কিন্তু একবার কথা দেওয়া হয়ে গেছে। তা তো আর ফিরিয়ে নেওয়া চলে না।

মামীমা উৎসাহিত হয়ে বলেন—"তা যদি পার বাবা, বড় উপকার করা হ'বে।" শান্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—"কি রে, তোর মামাবাবু রাজী হ'বেন তো?"

শান্তি হেসে উত্তর দেয়—"তা কেন হবেন না? কলেজে

পড়া মেয়েরা একলা একলা চলে যায়, তা ছাড়া আমি তো একেবারে অচেনা পুরুষের সঙ্গে যাচ্ছি না যে—।" বলেই অপর্ণার দিকে তাকাতেই তার চোখে দুষ্টু হাসি দেখা গেল. সে হাসির অর্থ—"সবচেয়ে বেশী চেনা পুরুষের সঙ্গেই তো চলেছি।" একটু থেমে আবার বলে "তোমাদের অজ্ঞাতে কারও সঙ্গে সরে পড়ার বয়সও আর নাই।" এবারে শান্তিলতা অপর্ণার দিকে তাকালো, অপর্ণা চোখের ইঙ্গিতে উত্তর দিল-- "তুমি মরেছ।" মামীমা কোন কথা বললেন না। সহসা গম্ভীর হ'লেন, তার মনে পড়লো বীরেনকে তো শান্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হোলো এবং বীরেনও রাজী হোলো—বীরেনের সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাবে শান্তিরও আগ্রহ কম নয়. এতে কিছু খারাপ হোলো কি না কে জানে। কিন্তু তার উপায় ছিল না যে প্রস্তাব ফিরিয়ে নেবেন। যা হোক্. শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হোলো যে আগামী কাল ভোরের ট্রেনেই শান্তিলতা বীরেনের সঙ্গেই যাবে। বীরেন সন্ধ্যার ঠিক আগে এসে এ সম্পর্কে পাকা পাকি করে যাওয়ার কথা বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই শান্তি বলে উঠলো—"বারে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব টুকু ঘাড়ে পড়তেই রাগ করে চলে যাচ্ছেন? চা খেতে হ'বে না?" "যা, তুই যে কি বলিস্। বীরেনবাবু কি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বতেই ঘাব্ড়ে গেছেন। তুই বীরেনবাবুকে অত ছোট ভাব্ছিস্ কেন. উনি ঢের বড় দায়িত্ব বহনে সক্ষম।"

সহাস্যে কথাগুলি বলে বীরেনের দিকে তাকিয়ে অপর্ণা বললো—"আপনি বলুন বীরেনবাবু, আমি ঠিক বলেছি কি না?" আর চেয়ারে না বসেই বীরেন বললো—"নিজের সম্বন্ধে কি করে অত বড় সার্টিফিকেট্ দিই বলুন।" মামীমা উঠে যেতে যেতে বললেন—"বীরেন, বস একটু চা খেয়ে যাবে।" "না মামীমা, এখন থাক্। ওবেলা এসে দু'কাপ খেয়ে যাব।" কাল বিলম্ব না করে বীরেন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শান্তিলতা জিজ্ঞাসা করলো—"তা হ'লে ওবেলা কখন আসছেন?"

উদাসীভাবে বীরেন উত্তর দিল—"এই যখন হোক্ একবার আস্‌বো।"

অপর্ণা ওকালতি করে বললো—"ও রকম বললে চলবে না বীরেনবাবু, নতুবা শান্তি বেচারীর ভুরী খারাপ লাগবে।"

"কি যে বলেন।" বলেই বীরেন বড় রাস্তায় নেমে পড়লো—

দরজার ফাঁক দিয়ে দু'টি আঁখি তখনও তার পায়ের তলায় আছাড় খেয়ে ফিরছিল।

বীরেনের সঙ্গে শান্তিলতার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'লেও ঘনিষ্ঠতম হওয়ার পথে জাতিগত স্বাভাবিক বাধা বর্ত্তমান। এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকায় অপর্ণা শান্তিলতাকে তখনো বৌদিরূপে পাওয়ার কল্পনা করে চলেছিল।

হারুকাকা মরবার পর বীরেন হারুকাকার অভাগা নিঃসঙ্গী মেয়ে পঞ্চু বা সমরের বিশেষ কোন খবর পায় নি। তাই ফেরার পথে বীরেন খবরের আশায় সমরের বাসা-বাড়ীর দিকে

রওনা দিল। ঘরের কাছে এসে ঘরের ভিতর কথোপকথনের আওয়াজ শুনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরের আবহাওয়ার সন্ধান নিতে লাগ্‌লে। বীরেনের কানে এল পঞ্চীর অভিযোগের সুর "কেন তুমি অত নেশা করো?" সমর জড়ান কথায় উত্তর দেয় "তা অ-ম-নি কি নেশা করি, কুষ্টিতে লে-খা-আছে ম-দ-না খেলে আমার মৃত্যু নি-শ্চি-ত; তু-মি কি চাও আমি মরে যা-ই?" "বালাই! ষাট্। আমি কি তাই বল্‌ছি?" কথার উত্তর দেয় পঞ্চী। "তবে অত বেশী করে কি খাওয়া ভাল?" এবার সমর হেসে বলে "তুমি আমার আর জন্মের স্ত্রী, এজন্মেও ফিরে পেয়েছি: তাই বলে কি তোমায় অবহেলা করতে পারি? এস মা-ই-রি আমার বুকে এস আমি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।" বীরেন আর ঘরের ভিতর প্রবেশ না করে রাস্তায় নেমে পড়ল। পথ চল্‌তে চলতে মনে পড়লো এ দেশের মেয়েদের সহ্যের কথা। মিলনের আনন্দে এঁরা কত না দুঃখই বরণ করে। প্রেমের তাগিদ্ এদের থাকে কি না কে জানে,—সংসারের সঙ্গী হিসাবে এঁরা যাকে বরণ করে নেয়, সামান্য একটু আশ্রয় পেলেই এঁরা খুসী মনে পতিব্রতার ইতিহাস সৃষ্টি করে. এইটাই এদের বৈশিষ্ট্য।

কবির কল্পনায় তুলি দিয়ে এঁকে তোলা গ্রাম আজ ধূলিমলিন। মানুষের মনে প্রাণে গাছে পাতায় পথে ঘাটে কি যেন একটা বেদনা—একটা হতাশার ভাব বিরাজমান, অভাব দারিদ্র্য

স্মৃতি

আজ সারা দেশের মেরুদণ্ডে আঘাত হান্‌ছে। মানুষ কল্যাণ-কামীদের বিশ্বাস করে না—নিজের উপরেও বিশ্বাস হারিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে—দিল্লীর লালকেল্লায় ভারতীয় আজাদী ফৌজের বিচার হ'য়েছে—দেশের বুকের উপর দিয়ে বিরাট আলোড়ন চলে গেছে—১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট ভারতের জনসাধারণ অবাঞ্ছিত হ'লেও দু'টি রাষ্ট্রের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা-সূর্য্যকে প্রণতি জানিয়েছে। তিমির রাত্রির যাত্রী জাতীয় জীবনের পূর্ব্বাচলে নতুন অরুণোদয় প্রত্যাশা করেছে। কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরেও রাত্রি শেষ হোলো কৈ—দুর্গম পথ যাত্রার ছেদ্‌ তো দেখ্‌ছি না? মানুষ বিভ্রান্ত, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, শিক্ষাভাব, বাসস্থানাভাব—চতুর্দ্দিকে কেবল অভাব—অভাব। দেশের জনসাধারণ আজ শবরীর অর্থাৎ রামের তথা মহাত্মা-পরিকল্পিত রাম-রাজত্বের প্রতীক্ষা করছে—কিন্তু আশার অঞ্জলি শুকাইয়া ওঠে হয়ত বেদনার ব্যর্থ প্রতীক্ষায়। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার ছবি আজ তো একান্ত কল্পনার বস্তুতে পরিণত। হাজার হাজার নর-নারীর ভূখা মিছিলই তো আজ দেশের সত্যকার ছবি। দেশের দিকে দিকে জাতীয় সরকারের কাছে খাদ্য বস্ত্র, ঔষধ পথ্য শিশুদের বাসস্থানের দাবীতে জনসভায় জন-মতের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। অতিরঞ্জিত হলেও বিরোধী দলের প্রচার বা বক্তব্যকে মিথ্যা বলা চলে না। এই ব্যাপারে হরীশপুরের বাজারতলায় একটি জনসভা হ'য়ে গেছে। যে

রাজনৈতিক দল আজ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে তারই মর্ম্ম কেন্দ্র পল্লী অঞ্চলে এই যে বিক্ষোভ এ কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? বুকের রক্ত দিয়ে—স্বপ্ন দিয়ে যারা স্বাধীনতার সাধনা করেছে তা কতিপয়ের খেয়াল খুসীতে কি নষ্ট হ'তে পারে? হরীশপুরের বাজারতলার সভায় আজ দেশের সত্যকার অবস্থা কি এবং মুক্তির পথ কোথায় এই হবে আলোচনা। বড় বড় পোষ্টারে সভা সম্পর্কে প্রচার করা হ'য়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন মানসময়ী বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট প্রবীন শিক্ষক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সভার প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত থাকবেন চিরকুমার ও বরেণ্য দেশ-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ মণ্ডল। বাইরে থেকে আরও দু'-একজন ভাল ভাল বক্তা আসার কথা আছে। আজ দেশের জনসাধারণের জীবন চতুর্দ্দিক থেকে বিভ্রান্ত : দৈনন্দিন জীবন দুর্ব্বিষহ ; মানুষ আজ মুক্তি-পাগল, পথের সন্ধান তারা পেতে চায় তাই দুপুর থেকে বাজারতলায় জনতা ভীড় করেছে : আজকের সভাতেই তারা ঠিক করবে তাদের কর্ত্তব্য কি—মুক্তি তারা কোন পথে পা'বে। সভারম্ভের কিছু আগে দেখা গেল—থানার বড় দারোগা সাহেব কয়েকজন পুলিশ নিয়ে হাজির হলেন, সরকারের বড় তোষামুদে চোরাকারবারী রাধা পাল একটা চেয়ার আর একটা বড় বেঞ্চ দোকান থেকে এনে তাঁদের বসতে দিলেন। পিছন' থেকে ওপাড়ার সুশান্ত সামন্ত মন্তব্য করলো—"চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, চোরাকারবারের সমর্থক পুলিশকে খাতির না করলে

রাধা পালের ভুঁড়ি বাড়ার পথ যে বন্ধ হ'য়ে যাবে।" সুশান্ত কাউকে তোয়াক্কা করে না।—দারোগাবাবু কটাক্ষে তার দিকে তাকালেন, সেও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দারোগাবাবুকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন প্রবীন ছেলেটার সাহস দেখে তো অবাক।

সভা আরম্ভ হোলো। কয়েকজন জ্ঞাত অজ্ঞাত বক্তার পরে গজেন্দ্রবাবু বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা দিতে উঠলেন। পুলিশ একটু চঞ্চল হ'য়ে নড়ে বস্‌লো এবং দারোগাবাবু উৎকর্ণ হয়ে বক্তৃতা শুনতে লাগলেন। গজেন্দ্রবাবু বলে চলেছেন—"......... যাঁরা আজ মস্‌নদে বসার পরেই মসনদের বনিয়াদ রচনাকারী দেশের লক্ষ লক্ষ চাষী মজুরের কথা ভুলে গেছেন তাঁরা যে মানুষ একথাও আজ কল্পনা করতে কষ্ট হয়। আমরা জাতীয় সরকার—জাতীয় সরকার বলে চিৎকার করতে পারি—কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হ'বে না। সরকারের অব্যবস্থায় অনভিজ্ঞ আত্মীয়দের হাতে ফসল ফলানোর জন্যে কোটি কোটি টাকা সরকার তুলে দিয়েছেন ; কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে চাষীর কাছে তার একটা ছোট্ট অংশও পেঁাছাচ্ছে না। প্রতি ইউনিয়নে কৃষি কেন্দ্র খোলা হয়েছে কিন্তু জনসাধারণের অর্থে পুষ্ট কৃষি কর্ম্মচারীরা তাস খেলা ছাড়া আর কি কাজ করেন তা জনসাধারণের বোধের বাহিরে। যে কোনো বিভাগের কথাই আলোচনা করুন না কেন সেখানে গলদের ও দুর্নীতির পাহাড় আবিষ্কার হবে। পুলিশের দিকে অংগুলি নির্দ্দেশ করে

গজেন্দ্রবাবু বলেন "ঐ যে দেখ্‌ছেন—যাঁরা আসর সাজিয়ে আর জাঁকিয়ে বসে আছেন এ'দের পুষ্‌তে আজ রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। অথচ ওরা কোনো কাজ তো করেন না, যত অকাজ করে নানাদিক থেকে রাষ্ট ও সমাজের অকল্যাণ সাধন করছেন।" জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। চারিদিক থেকে এক সংগে হাততালি পড়ে। গজেন্দ্রবাবু টেবিলে জোরে একটা আঘাত করে বলেন—"বন্ধুগণ, কোন উচ্ছ্বাস নয়—কোনো ভাবপ্রবণতা নয়—যা খাঁটি সত্য তাই আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরছি, যে পুলিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে ঘর ও দেশের গোপন স্থান থেকে সামান্য টুক্‌রো কাগজ সন্ধান ক'রে দেশের মুক্তিপাগল তরুণ-যুবকদের শাসন ও শাস্তি দান করেছেন তাঁরা আজ কোথায় চোরাকারবার হয় জানেন না—একথা পাগলেও বিশ্বাস করে না। আপনারা চিনে রাখুন এদের, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিন এরা বিদেশী শক্তিকে কায়েম করার জন্যে দেশ সেবকের প্রতি নির্ম্মম অত্যাচার করেছে আজ স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও এদের সেই বিশ্বাযঘাতকতার শেষ হয় নি।"

সুশান্ত, সামন্ত ও তার বন্ধুর দল এই সময় Shame Shame করে চিৎকার করে ওঠে। গজেন্দ্র বলে চলেন—"ভাই সব, যদি আজ আপনারা সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারেন তাহ'লে সকল অন্যায়, সকল অবিচার প্রতিরোধ করা সহজ ও সম্ভব হ'বে, ভয় করবেন কাকে—আপনাদের ত্যাগের উপরেই

আজকের স্বাধীনতার মণিসৌধ গড়ে উঠেছে,—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে স্বাধীনতা আপনাদের ভোগে আস্‌ছে না। আপনারা দেশের কোটি কোটি চাষী মজুর পরিশ্রম করে ফসল ফলাচ্ছেন, তার ফলভোগ করছে কতিপয় সুবিধাবাদী জমিদার ও ব্যবসাদার, এই বৈষম্যের অবসান চাই।" জমিদারের দারোয়ান রাম সিং এতক্ষণ ধীরভাবে বক্তৃতা শুন্‌ছিল। পুলিশকে গালাগাল দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত তার খইনি খাওয়ার কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি ; কিন্তু যেই জমিদারের কথা উঠ্‌লো অমনি সে বিরক্ত হ'য়ে উঠলো, হঠাৎ দেখা গেল সভার কোণের দিকে একটা বিরাট হৈ চৈ—সব লোকই এক সঙ্গে ঠেলাঠেলি করতে লাগলো, সভাপতি ও গজেন্দ্র প্রাণপণ চিৎকারেও গোলমাল থামাতে সক্ষম হ'লেন না, পুলিশ লাঠী উঁচু ক'রে এগিয়ে গেল গোলমালের দিকে, হঠাৎ জনতার মাঝখান থেকে পুলিশের দিকে ইট পড়লো। শান্তিরক্ষকগণ জনতা ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে মৃদু লাঠি চালনা করলেন,—রাম সিং এর রাগ ছিল গজেন্দ্রর উপর ; গোলমালের মাঝে সে এক ফাঁকে গজেন্দ্রের মাথা লক্ষ্য করে এক-ঘা লাঠি বসিয়ে দিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে লাঠির আঘাত প্যাণ্ডেলের একটা খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে পাশের ভদ্রলোকের কাঁধের উপর পড়লো। পুলিশ ও জনতায় এবং জনতায় জনতায় কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি হওয়ার পরে জনতা ছত্রভঙ্গ হোলো। দারোগাবাবু শান্তিভঙ্গের দায়ে সভাপতি, গজেন্দ্র ও আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলেন। উপস্থিত জনতা

আপত্তি জানালো, কিন্তু ন্যায়, সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী গজেন্দ্র বিনীত অনুরোধে তাদের শান্ত ক'রে পুলিশের কাছে সদলে আত্মসমর্পণ করলেন। যথাসময়ে পিতা শশাঙ্কশেখরের কাছে এই সংবাদ গেল। অন্য সময় হ'লে তিনি এতে এতটুকু বিচলিত হ'তেন না, বরং বীর সন্তানের গর্ব্বে গৌরব অনুভব করতেন, কিন্তু আজ তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ গজেন্দ্রের গর্ভধারিনী যে শয্যাশায়ী—এমত অবস্থায় পুত্রের হাজতবাস সত্যই বৃদ্ধের পক্ষে গভীর দুঃখের কারণ হোলো। অন্তরের দুঃখ ও ব্যথাকে তিনি বাইরে প্রকাশ করলেন না। ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে মনে মনে বললেন—"ভগবান, তোমার আশীর্ব্বাদে সত্য যেন জয়ী হয়। অত্যাচারীর রক্তাক্ত অভিযান যেন দ্রুত শেষ হয়। জাতির ভাগ্যাকাশে যেন নবারুণের স্নিগ্ধ দীপ্তি দেখে মরতে পারি। আমার পুত্রগণ নিজেদের আরাম বিলাস ত্যাগ ক'রে মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছে—এ তো আমার গর্ব্ব ও আনন্দ। মানুষের মাঝ থেকে দূরে গিয়ে তারা ব্যক্তি-স্বার্থে মসগুল নয়—এই তাদের মনুষ্যত্ব, ভগবান! সকল প্রতি-কূল অবস্থার সামনে দাঁড়ানোর শক্তি তুমি তাদের দিয়ো।" বৃদ্ধ কপালে হাত ঠেকিয়ে তাঁর ধ্যানের দেবতাকে প্রণাম জানালো।

ভোর বেলার ট্রেন—বুধবার, কোনো ছুটির দিনে নয়—বীরেন ও শান্তিলতা একটা ফাঁকা কামরা দেখে উঠে বস্‌লো। একটা আধময়লা কাপড়পরা ভবঘুরে জাতীয় লোক একবার দরজার পাশে উঁকি দিয়ে চলে গেল।

শান্তি

ট্রেনখানি পরিচিত শব্দ করে ছাড়বার পরেই বীরেন একটা বন্ধ-করা জানালা খুলতে খুলতে বললো—"কি শান্তি, কাল থেকে ভেবেছি দু'জনে একলা একলা দীর্ঘ ট্রেন-যাত্রার এই প্রথম সুযোগে প্রাণ ভরে গল্প করবো। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আজ তুমি মৌনীবাবা হয়েছ। বলি ব্যাপারখানা কি?" রুমাল দিয়ে বেঞ্চটা ঝেড়ে একটু আরাম করে বসে নিয়ে বীরেন আবার সুরু করে—"তা তুমি এত দূরে বস্‌লে কেন শান্তি?"

"তা এত বড় কামরাটা তো ব্যবস্থা করা দরকার?" বলেই শান্তি জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে মাথাটা হেলিয়ে দিল।

বীরেন ব্যস্ত হয়ে বললো—"ওকি শান্তি! যদি হাওয়া খাবে তা হ'লে এখানে এই পাখার তলায় এস।"

"না—না—তার দরকার নাই, এই আমি ঠিক হ'য়ে বস্‌ছি।" সত্যই শান্তি সংযত হয়ে বসলো।

"শান্তি, কেন আজ তুমি এমন লুকোচুরি খেলছো, পাশটিতে এসে বস লক্ষ্মীটি।" বীরেন শান্তির প্রতি এক দৃষ্টে তাকায়। শান্তির কিন্তু ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। পায়ের দিকের শাড়ীটা ঠিক করতে করতে বললো —"না, ওখানে যাওয়ার দরকার হ'বে না—এখান থেকেই তো আপনার কথা শোনা যাচ্ছে।" বলে শান্তি আবার বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। এমন সময় এক ঝল্‌কা ধোঁয়া আর কয়লার গুড়ো শান্তির মুখে-চোখে এসে লাগলো। শান্তি

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চশমা খুলে রুমালে চোখ ঢাকলো। বীরেন বললো—"কি শান্তি, ধোঁয়া খাওয়ার খুব সখ হয়েছে বুঝি।"

"না—না—তা কেন হ'বে? কোনো অসুবিধা হ'চ্ছে না।" "না তা হ'বে কেন? ধোঁয়া তো আর পুরুষ মানুষ নয় যে গায়ে পড়ে লজ্জা দেবে।" শান্তি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে শাড়ীর আঁচলটা বুকে ঠিক মত দিয়ে একেবারে বীরেনের পাশে এসে গম্ভীর হ'য়ে বসে পড়লো এবং বললো—"রক্ষক কখনো ভক্ষক হবেন না জানি।" শান্তির গলার স্বর একটু যেন কাঁপা। বীরেন তা লক্ষ্য করলো না। বললো—"তাতে দোষ কি শান্তি?"

"দোষ অনেক আছে বীরেনদা!" শান্তি অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত। বীরেন চমকে উঠলো—কারণ সে তো নিরালায় বহু দিন শান্তির কাছ থেকে বীরেনদা সম্বোধন শোনেনি; সে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলো না, তাই বললো "শান্তি, আজ তুমি কি যেন আবোলতাবোল বকছো, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে না কি?"

"না, বীরেনদা, মাথা আমার ঠিক আছে, দয়া করে আপনি আমায় বাঁচান—আমায় ক্ষমা করুন—আমায় মুক্তি দিন।" শান্তি মাথা নীচু করে কপালে হাত দিয়ে চোখ ঢাকে। তার চশমার ফাঁক দিয়ে উদ্যত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। বীরেন উঠে দাঁড়ায় কিন্তু শান্তিকে ছুঁতে পারে না—কেমন যেন সঙ্কোচ এল, বললো—"শান্তি ব্যাপার কি বল—আমার প্রাণ দিয়েও যদি

তোমার উপকারে লাগতে পারি সে তো আমার পরম আনন্দ ও তৃপ্তি।"

শান্তি ব্লাউসের ভেতর থেকে একটা খাম বার ক'রে কম্পিত হাতে বীরেনকে দেয়। বীরেন অধীর আগ্রহে চিঠি পড়তে থাকে। তার কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখলেই তার আশাহত ও উত্তেজিত প্রাণের ইঙ্গিত লক্ষ্যে পড়ে। শান্তি চিঠির কথা ভাবতে থাকে। প্রতি লাইন তার মুখস্থ যে—বীরেন কোন অংশ পড়ে কতটা আঘাত পাচ্ছে তা সে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করে। কাল সন্ধ্যার আগেও সে জানতো না যে তার মা তাকে এইজন্যে ডেকেছেন। চিঠিটা খুব বড় নয়—শান্তির বিয়ের প্রায় সব ঠিক, খুব সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যবসায়ী বংশের যোগ্য পাত্র সহসা সংগ্রহ হ'য়ে গেছে. শান্তির মা-বাবার ইচ্ছা ছিল আরও কিছু দিন অপেক্ষা করার। কিন্তু পাত্রের ঠাকুরদা শয্যাশায়ী. নাত্‌বৌ দেখে যাওয়ার ইচ্ছা পূরণই যদি না হয় তবে এত বিত্ত ও সম্মানের মূল্য কি? কাজেই পাত্রীপক্ষের রাজী হ'তে হয়েছে. শান্তিকে পাত্রের মামাবাবু স্বয়ং বিশেষভাবে চেনেন. সুতরাং কথাবার্ত্তা প্রায় পাকা করায় আট্‌কায় নি। বীরেন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শান্তির হাতে চিঠিটা ফেরত দিয়ে অন্য একটা বেঞ্চে গিয়ে চুপ্ ক'রে বসলো।

শান্তি বীরেনকে ডেকে বললো—"শুনুন বীরেনদা, গতকাল বৈকালে আপনি আসার পরে যখন কাল চিঠিটা

পেয়েছি তখন থেকে আমার মনের মধ্যে প্রবল ঝড় বয়ে গেছে, সারা রাত্রি ধরে চিন্তা করেছি।" একটু থেমে আবার সুরু করে "চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি—আজ আপনার আমার এবং আপনার ও আমার পরিবারের কল্যাণের জন্য আমার এই বিয়েতে সম্মতি দেওয়া প্রয়োজন।" বীরেন বিশ্বাস করতে পারে না তার স্বপ্ন ও ধ্যানের শান্তি তাকে এই সব কথা বল্‌ছে। শান্তি একটু থেমে আবার বলে—"বীরেনদা, আমি ভেবে দেখেছি আপনার আর আমার সামান্য মোহকে চরিতার্থ করতে গিয়ে আমরা দু'টি জীবনকেই হয়ত নষ্ট করবো, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না যেন, আমি আপনার ভালবাসার উপর সন্দেহ প্রকাশ করছি না। সত্যি কথা বলতে কি হয়ত আপনার মত গভীর ভাবে আমার স্বামী আমাকে ভালবাসবে না, তবুও তাঁর সংগেই সারা জীবন অভিনয় ক'রে যেতে হ'বে—আর সেই অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়বে আপনাকে।"

"শান্তি, তোমার মধ্যে একদিনেই এই পরিবর্ত্তন আসবে এ কল্পনাও আমি করিনি, আমাদের মিলনের পথে বাধা কোথায় আবিষ্কার করলে?" একটু থেমে বীরেন বলে—"ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম্মের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা খুঁজে নেবো।"

"তা হয় না বীরেনদা, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান, দয়া করে ক্ষণিকের ভুলে নিজেকে এমন

ভাবে বিসর্জ্জন করবেন না। আপনার সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনে আমার চেয়েও ঢের ভাল সঙ্গিনী পাবেন। আমাকে ভুল বুঝবেন না, আপনার কল্যাণ চাই বলেই আজকে আপনার কথাও আমাকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হ'চ্ছে। উচ্ছ্বাস একদিন প্রশমিত হবেই। কিন্তু তরুণ মনের মাদকতা নিয়ে আজ যদি আমরা হিসাব নিকাশ না করেই কিছু করে বসি সেটা হ'বে আমাদের হঠকারিতা—আমাদের ভবিষ্যৎকে সব দিক থেকে অন্ধকার করে দেবে। বীরেনদা, যদি আপনি বুঝতেন আপনার জন্যে আমার অন্তরে—" শান্তি আর বলতে পারলো না, তার চোখ জলে ভ'রে এল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপতে লাগলো—আর মনে মনে ভগবানের কাছ থেকে সাহস সঞ্চয়ের প্রার্থনা জানালো। কারণ দৈবদুর্ব্বিপাকে আজ যে ঘটনা ঘট্‌বে কালের গতিতে বীরেনের মত আদর্শবাদী ছেলের জীবন ছন্নছাড়া অবস্থায় ঘোরাফেরা করবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অগণিত দরিদ্র ও অবুঝ নর-নারীর জীবন হাহা করে প্রাণের জ্বালায় একটুখানি আলোর প্রত্যাশায় ঘুরে বেড়াবে ; আজ সে আদর্শকে মিথ্যা সৌধ দিয়েও বাঁচিয়ে রাখতে হ'বে।

একমুহূর্ত্ত চিন্তা করে নিয়ে বীরেন বললো—"শান্তি, তুমি সত্যই আমাকে বাঁচিয়েছ, তোমার দৃঢ়তাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। পরিচয়টাই প্রেম নয়, এই শিক্ষা তোমার কাছ থেকে লাভ করলুম—সারা জীবন এটা স্মরণে রাখবো।"

বীরেন খুব কমই সিগারেট খায়, কিন্তু আজ যে তার কি হোলো—সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে চললো।

ব্যর্থ প্রেমের কি জ্বালা ; এত সঙ্গোপনে থেকে তার যে কি দাহ শান্তি তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে। বীরেনের উপেক্ষা অবহেলাই আজ তার প্রাপ্য, নইলে তার মত একজন সামান্য নারীর মোহে এত বড় দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ আদর্শ নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। ভগবান! কবে সেই সমাজ-ব্যবস্থা মানুষের মনে সহজ ও সরল হয়ে গড়ে উঠবে যেদিন প্রেমের সম্পদ রচনায় মানুষের কোন ভেদাভেদ রচিত হবে না।

যথাসময়ে ট্রেন এসে ষ্টেশনে থামে, শান্তিকে নিয়ে বীরেন নামে প্লাটফর্ম্মে। সঙ্গের জিনিষপত্রগুলো নেওয়ার জন্য পরিচিত একটা মুটেকে ডাক দেয়। বাড়ীর কাছের ষ্টেশন—সবাই প্রায় শান্তিকে না হ'লেও বীরেনকে চেনে। একজন মুটে এসে দু'হাতে দু'টো সুটকেশ তুলে নেয়। ষ্টেশনের বাইরে এসে গরুর গাড়ীর জন্য বীরেন এদিক ওদিক তাকাল। জমিদার বাড়ীর অর্থাৎ শান্তিলতাদের বার মাসের বাঁধা দুটো গাড়োয়ান তখন অন্য যাত্রী গাড়ীতে বোঝাই করে ছাড়বার উপক্রম করেছে, বেচারীরা ফ্যাঁসাদে পড়লো, যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া চলে না, আর জমিদার দুহিতা শান্তিকেও না নিলে নয়। অবস্থা বুঝে শান্তি গাড়োয়ান দু'জনকেই উদ্দেশ্য করে বললো "সামু, তোমরা যাও। আমি অন্য গাড়ীতে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।" গাড়োয়ানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল।

বীরেন অন্য একটা গাড়ী ঠিক করে শান্তিকে নিয়ে চড়ে বস্‌লো। গাড়ীতে বসে বীরেন ও শান্তির মধ্যে বিশেষ কোন কথা হোলো না। মানসময়ী বিদ্যালয় থেকে দূরে সেই গাছের ফাঁক দিয়ে শীর্ণ খালের সেই জায়গাটা—যেখানে বসে দিনের পর দিন শান্তি বীরেনের কাছে অঙ্ক শিখেছে আর কল্পনার জাল বুনেছে সেখানটা স্পষ্ট দেখা যায়। গরুর গাড়ী এগিয়ে চললো—সেই স্থানটা লক্ষ্য পড়তে দু'জনের এক সঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। শান্তি নিঃশ্বাস চাপবার চেষ্টা করে অন্য দিকে মুখ ফেরালো। বীরেন বললো—"শান্তি, জন্মের মত বিচ্ছেদ নেমে আসবে আমাদের জীবনে। কিন্তু শীর্ণ খালের ধারের স্মৃতি অক্ষয় হ'য়ে থাকবে আমার মনে—জানি না তার কোন দাম তোমার জীবনে থাক্‌বে কি না।" বুক ঠেলে শান্তির দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে, চোখের কোণে তার জল টলমল করে ওঠে। গারোয়ানটা একবার পিছন ফিরে দেখে। গাড়োয়ান বলে "বাবু খালের সাঁকো ভেঙে গেছে, গাড়ীতো গাঁয়ের ভেতর যাবে না।" অগত্যা বীরেন ও শান্তিকে খালের ধারে নামতে হোলো। কাছেই একটা মধ্য-বয়সী বাগ্‌দীদের ছেলে দাঁড়িয়ে-ছিল। বীরেন তাকে বললো—"ভাই, কোন লোকজন মিলবে কি, আমাদের সুটকেশ দু'টো নিয়ে যাবে?" ছেলেটি বীরেনকে চিনতো, বললে—"দাদাবাবু আমিই দিয়ে আসবো, আপনার জিনিষ—হে" বলেই তার ময়লা গামছাটা কোমরে গিট দিয়ে বেঁধে দু'হাতে দু'টো সুটকেশ তুলে নিয়ে পুলের উপর দিয়েই

অভ্যস্ত গতিতে এগিয়ে গেল। শান্তি ও বীরেন একে একে অত্যন্ত সাবধানে বাঁশের পুল পার হোলো। কি জানি কেন সহসা বীরেনের কাছে গ্রামটা ছন্নছাড়া মনে হোলো—তার অন্তরটা কেন যেন হাহাকার করে উঠলো—এতক্ষণ মায়ের অসুখের কথা বীরেনের মনে পড়ে নি। হঠাৎ মনে পড়ায় যেন চম্‌কে উঠলো,—বীরেনের হাটাটা একটু তাড়াতাড়ি হচ্ছিল। হঠাৎ মনে হোলো—আহা, শান্তি বেচারীর কষ্ট হ'চ্ছে, গতি একটু মন্থর করে দিল।

জমিদার বাড়ীর কাছাকাছি এসেই বীরেন দেখে যে গ্রামের প্রায় সব লোক দল পাকিয়ে হাতে লাঠি বাঁশ, কাস্তে নিয়ে এসেছে : বিরাট সোরগোল--সবাই বলছে রাম সিং বেটার মাথা চাই। বীরেন ধীর ভাবে একজনকে ডেকে ঘটনাটা শুনলো—কাল নাকি মিটিং-এ রাম সিং গজেন্দ্রের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার জন্যে লাঠি মেরেছিল, ভাগ্যিস একটা পোষ্টে লেগে সেটা রাম ঘাঁটির ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিল! তা না হলে তো গজেনবাবু মারাই যেতেন, এমন উপকারী লোক! গ্রামের লোক আজ পাগল হ'য়ে গেছে—জমিদারের অত্যাচারে তারা জর্জরিত! এর হিসাব-নিকাশ তারা আজই করবে। যা হোক, বীরেন সমস্ত ঘটনা শুনে তাদের বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিল এবং শান্তিকে বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলো। শান্তি কোনো কথা না বলে একবার কেবল বীরেনের মুখের দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। যে ছেলেটা সুটকেশ নিয়ে এসেছিল

বীরেন পকেট থেকে তাকে একটা সিকি দিতেই সে বললো—"তা হ'বে না দাদাবাবু, আপনার কাছ থেকে আমি কিছু নিতে পারবো না। আপনাদেরই তো খেয়ে আছি।"

সে জানতো বীরেনের কাছ থেকে একটা সিকি নেওয়ার চেয়ে বীরেনের বাড়ী গেলে এমনি এক সের চাল পাওয়া যাবে। একটু এগিয়ে যেতেই বীরেন দেখে তাদের বিশেষ হিতাকাংখী পানু বাগ্দী পড়ি কি উঠি করে ছুটে আস্ছে। বীরেন একটু থম্কে দাঁড়ালো, বীরেনের কাছে এসেই পানু কেঁদে বললো—"হায় বাবু, যদি আধঘন্টা আগে আসতেন—হায়! মা যেন আপনারি জন্যেই"—পানু আর কথা বলতে পারলো না। ময়লা গামছাটায় চোখ ঢেকে রাস্তার ধূলোতেই বসে ছোট ছেলের মত কাঁদতে সুরু করলো। বীরেনেরও যেন শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। বীরেন অপেক্ষা না করে ছোট ছেলের মত কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর দিকে ছুটে চললো ; যতই বাড়ীর কাছাকাছি এল ততই কানে ভেসে এল সম্মিলিত কান্নার সুর। বীরেন গিয়ে যোগ দিল সেই কান্নার রোলে : ডাক্তারী পড়ে সে কত মৃত্যুই—কত কঠিন, মর্ম্মস্পর্শী মৃত্যুর দৃশ্য—সে প্রত্যক্ষ করেছে—দুঃখ হয়ত হ'য়েছে ; কিন্তু দুর্ব্বলতায় কোনো দিন কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেলে নি। কিন্তু আজ নিজের মায়ের মৃত দেহের পাশে বীরেন ধূলি-লুণ্ঠিত। বৃদ্ধ শশাঙ্ক কাঁদতে পারছেন না, তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে ; মায়ের মৃত্যু লগ্নে বড় ছেলে হাজতে আর ছোট ছেলে তার অতীতের স্বপ্ন সঙ্গিনী শান্তিকে নিয়ে ব্যস্ত!

একথা ভেবে বীরেনের ধিক্কার হোলো নিজের জীবনের উপর।

বীরেন এতক্ষণ শ্মশানে একটা পোড়া কাঠের উপর বসে মায়ের জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়েছিল—মনে মনে প্রার্থনা করছিল—"তুমি তো জান মা, তোমার প্রতি আমার ভক্তির গভীরতা কত।" গতকাল না আসতে পারার জন্যে মায়ের উদ্দেশ্যে লজ্জা প্রকাশ করে মনে মনে বললো—"ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় তোমার প্রতি অজ্ঞাত যে অবিচার করেছি সেটা আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্বীকার করছি! মা তুমি ক্ষমা কোরো—আর সেই সঙ্গে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি তোমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ না হওয়ার ব্যথা ও আঘাত জীবনভর সাহসের সঙ্গে বয়ে বেড়াতে সক্ষম হই। আমি জীবনে কিছু চাই না—তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কোরো।" বিহ্বল হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া মাকে প্রণাম জানায়।

গতকাল পুলিশ গজেন্দ্রকে জমিদারের প্ররোচনায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে সত্যিকার অভিযোগ না থাকায় হাকিম ২০০৲ শত টাকা জামিনে তাঁর মুক্তি দিয়েছেন। কোর্ট থেকে আসতে যথেষ্ট দেরী হ'য়েছে। এসে যখন শুনলো মা ইহলোকে নাই তখন স্তম্ভিত হোয়ে গেল, একটু দাঁড়িয়ে বিরাজকে সান্ত্বনা দিয়ে শ্মশানাভিমুখে চলে গেল। তখনও চিতার আগুন নিভে নি—মাতার সোনার বরণ দেহ প্রায় ভস্মীভূত হ'য়ে এসেছে, চিতার কাছাকাছি যেতেই সেখানের শবদাহরত লোকেরা "বল-হরি হরি বোল" করে উঠলো।

বীরেন উঠে দাঁড়ালো, দাদার মুখের দিকে তাকালো—মুখে কথা নাই, দু'জনের চোখেই জল। মেজ ভাই উঠে এসে গজেন্দ্রের হাত ধরে চিতার কাছে নিয়ে যায়, একখানি চন্দন কাঠ দাদার হাতে দিয়ে বলে—"দাদা, মাকে তোমার হাতে আগুন দাও।" গজেন্দ্র যন্ত্র-চালিতের মত কাজ করে। চিতার আগুনের শেষ শিখা যখন নিভলো তখন গোধূলি গড়িয়ে গেছে।